প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি ১৯৫৭

প্রকাশক : সুভাষচন্দ্র দে। দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

শব্দগ্রন্থন : রবিশঙ্কর বণিক। মাইক্রোডট্ কম্পিউটার
২০ শ্যামপুকুর লেন। কলকাতা ৭০০ ০০৪

মুদ্রক : স্বপনকুমার দে। দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

"মনে রাখা দরকার, ধর্ম আর ধর্মতন্ত্র এক জিনিশ নয়। ও যেন আগুন আর ছাই। 'ধর্মতন্ত্রের কাছে ধর্ম যখন খাটো হয় তখন নদীর বালি নদীর জলের উপর মোড়লি করিতে থাকে। তখন স্রোত চলে না, মরুভূমি ধুধু করে। তার উপরে, সেই অচলতাটাকে লইয়াই মানুষ যখন বুক ফোলায় তখন গণ্ডস্যোপরি বিস্ফোটকং।"

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম'

সূচিপত্র

পূর্বভাষ

বছর চারেক আগে একান্ত ব্যক্তিগত মুহূর্তে কবীর-পদাবলির অনুবাদ শুরু করি। দেখতে-দেখতে মাসখানেকের ভেতর বেশ কিছু সংখ্যক অনূদিত কবিতা জমে ওঠে। তার থেকে নির্বাচিত কয়েকটি ১৩৯৮-এর 'প্রতিক্ষণ' শারদীয় সংখ্যায় 'কবীর ও তাঁর কবিতা' শিরোনামে ভূমিকা ও শব্দ-সংকেতসহ প্রকাশিত হয়।

সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিষাক্ত পরিমণ্ডলে পরিস্থিতি তখন ক্রমশই ঘোরালো হয়ে উঠেছে। বিংশ শতাব্দীর উপান্ত্যেও আমাদের দেশ-কালে মন্দির আর মসজিদ নিয়ে বিবাদে, যুযুধান দু-পক্ষ অভিযোগ আর ঘৃণায় ফুঁসছে তখন। যথার্থ অভিভাবকহীন সমাজে ধর্ম আর ধর্মতন্ত্রের পার্থক্যও যেহেতু উপলব্ধি করা সম্ভব হয়ে ওঠে না, তাই বিপন্নতাও ঘোচে না সহজে। এতদিনকার সহাবস্থানেও পারস্পরিক ধ্বংস ছাড়া অন্য কিছুই বোধগম্য হয় না, বিবেকহীন রাজনীতির চর্চায় সাম্প্রদায়িকীকরণ হয়ে ওঠে যখন অন্যতম হাতিয়ার। স্বরাজের নামে যে কমিউনাল অ্যাওয়ার্ড ঔপনিবেশিক শাসনের সূত্রে এই উপমহাদেশ পেয়েছিল, তাকেই আরো প্রসারিত করা হয় স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত রাজনীতির অঙ্গ হিশেবে। গত এক দশকে ভারতবর্ষে ধর্মস্থানকে কেন্দ্র করে পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ এবং কাশ্মীরে যেসব বিপর্যয়কর ঘটনা ঘটে যায়, তার পরিপ্রেক্ষিতে আবহমানকাল ধরে মানুষের মনে ধর্মস্থান সম্পর্কে গড়ে-ওঠা শ্রদ্ধাবোধও যে অনেকটাই আহত হয়,তা নিশ্চয় বলার অপেক্ষা রাখে না।

এরকম এক অবস্থায় জনৈক বন্ধুকে একদিন বলি—এই যে সব ঘটনা ঘটছে চারদিকে, কী মনে হচ্ছে এসব দেখে? বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে সে আমায় বলে—'এদের কারোর জীবনে কোনো প্রেম নেই, তাই এসব করছে।' উত্তরটা দার্শনিকের মতো শোনালেও, তার মন্তব্য মনে লাগে। সে নাস্তিক, তেমন কোনো ধর্ম-জিজ্ঞাসাও নেই তার। জীবিকায় ব্যবসায়ী। সে তো কবীরকে জানে না তেমন। কিন্তু তার ওই কথা এক হিশেবে তো কবীরেরই। এমন কথাই তো কবীরের পদাবলিতে আমরা কতবার পেয়ে যাই। কবীর তাঁর সময়ে সমাজের ওপরতলার লোকজনের এবং প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের স্বার্থবুদ্ধিকে উপলব্ধি করেছিলেন একরকমভাবে। কিন্তু যে পরিপ্রেক্ষিতে এই লোকায়ত সাধক হিন্দু-মুসলমান নামক দুটি সন্নিহিত কোণের মিলনবিন্দু হিশেবে চিহ্নিত হন, তা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির চেয়ে আলাদা। তাঁর কাছে আত্ম-ধর্মের উদ্বোধনই বড় কথা ছিল। তাঁর ধর্মচিন্তা ব্যক্তির নিজস্ব সাধনার সঙ্গে জড়িত। আজকের দিনে রোচকশব্দ সাম্প্রদায়িক-সম্প্রীতির যে ভাবাত্মক রূপটি বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের বিশ্বাস-অবিশ্বাস ও আচার-বিচারের প্রতি সমান মর্যাদাদানের নিরিখে তথা শ্রদ্ধা-প্রদর্শনের ভিত্তিতে গড়ে তোলা হয়েছে, তার সঙ্গে কবীরের দৃষ্টিভঙ্গির অমিলই বরং বেশি। তাঁর পদে যোগী, অবধূত, পাঁড়ে, মোল্লা এই ধরণের যেসব সম্বোধনে এদের লক্ষ্য করে আক্রমণাত্মক বচন দেখতে পাওয়া যায়, প্রকৃতপক্ষে তা কবীরের নিজস্ব বিশ্বাসের নিরিখে এদের মতামত খণ্ডনের সাক্ষ্যই বহন করে। সাধু বা সন্ত সম্বোধনে যেসব কথা তাঁর পদাবলিতে পাওয়া যায়, সেসব ক্ষেত্রে তাঁর নিজের মতামতটুকু ব্যক্ত করেছেন তাদের উদ্দেশে যারা তাঁর বক্তব্য মেনে চলতেন। একেশ্বরবাদী হিশেবে কবীরের আসল পরিচয় ভক্তরূপেই। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে তাঁর নিজস্ব অবস্থানও তাই এই পরিপ্রেক্ষিতে অন্যতর দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার্য হয়ে ওঠে। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের বিচিত্র অবস্থানে কবীরের জেহাদও তাই এক হিশেবে বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মের তো বটেই, নাথপন্থের বেদ-ব্রাহ্মণবিরোধী অবস্থানের উত্তরাধিকারও বহন করেছে।

আজকের ভিন্নতর পরিস্থিতিতে যখন বিপন্ন বিস্ময়ে তাকাতে হয় লোকধর্মের পথিকদের দিকে—প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের বাইরে হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনায় ভারতীয় মধ্যযুগে গড়ে-ওঠা তাঁদের

সম্পদের প্রতি নজর পড়ে, তাঁদের সেইসব সম্পদ অনুধাবনের দায় একালের মানুষজনের ওপর বর্তায় বলেই আমাদের পক্ষে এটাও মনে রাখা জরুরি, আপন-মনের মাধুরী মিশিয়ে বিশেষ কোনো ছকের ভেতর কবীর এবং তাঁর মতো সাধকদের বিবেচনা করাও অসংগত হবে।

রবীন্দ্রনাথ 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' প্রবন্ধে লিখেছিলেন—

"মনে রাখা দরকার, ধর্ম আর ধর্মতন্ত্র এক জিনিশ নয়। ও যেন আগুন আর ছাই। ধর্মতন্ত্রের কাছে ধর্ম যখন খাটো হয় তখন নদীর বালি নদীর জলের উপর মোড়লি করিতে থাকে। তখন স্রোত চলে না, মরুভূমি ধু ধু করে। তার উপরে, সেই অচলতাটাকে লইয়াই মানুষ যখন বুক ফোলায় তখন গণ্ডস্যোপরি বিস্ফোটকং।"

"মুক্তির মন্ত্র পড়ে ধর্ম আর দাসত্বের মন্ত্র পড়ে ধর্মতন্ত্র"—রবীন্দ্রনাথের এহেন মন্তব্য স্মরণে রেখেই আমরা বুঝে নিতে পারি মুসলমান-শাসন কায়েম হবার পর উত্তর-দক্ষিণব্যাপী সেই মুক্তির মন্ত্রই ভারতবর্ষ শুনতে পায় ভক্তি-আন্দোলনের সূত্রে। কর্ম, জ্ঞান আর ভক্তি—এই তিন প্রকার ধর্মসাধনার কথা বহুকাল আগে থেকেই ভারতের সনাতন ধর্মে ঘোষিত হলেও মধ্যযুগে এই তিনটির প্রচারও বিশেষ ভাবে হয়েছিল এদের পরস্পর সম্পৃক্ততার কারণেই। আপাত বিচ্ছিন্ন বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এরা তা নয়। মধ্যযুগে ভক্তি যুগধর্ম হিশেবে চিহ্নিত হয়েছিল, এ আমাদের জানা বিষয়। তেমনই দ্রাবিড় দেশে ভক্তির উৎপত্তি হয়ে রামানন্দর সূত্রে কবীরদাসের মাধ্যমে তা ছড়িয়ে পড়ে এমন কথাও প্রবাদে আছে।—*ভক্তি দ্রাবিড় উপজী লায়ে রামানন্দ।/ প্রগট কিয়া কবীরনে সপ্তদ্বীপ নব খণ্ড।* রামানন্দ এবং কবীরের সময়-নির্ধারণের ব্যাপারেই যখন বিতর্ক, প্রবাদ-বচনের সারকথা তখন নিশ্চয় উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে ভক্তি-আন্দোলনে উদ্ভূত রসধারাকেই বিবেচনা করতে হয়। উত্তর ভারতে রামানন্দর মতো ধর্মগুরুর প্রভাবে ভক্তি-আন্দোলনও যে অন্যতর মোড় নেয়, সমাজের নিম্নবর্গের মানুষজনকে সেই প্রভাব থেকে দূরে না রেখে তা যে আরো ব্যাপক হয়ে ওঠে—এও তো এক বড় রকমের ঘটনা। পরবর্তীকালে রামানন্দের মতো ধর্মগুরুর প্রভাবে, কী সুফি সাধকদের প্রভাবে লোকধর্ম যে ভক্তি-আন্দোলনের ধারাকে বিচিত্রগামী করে তোলে, তাও তো আমাদের একেবারে অজানা নয়। কিন্তু "অতীতের থেকে উঠে আজকের মানুষের কাছে" যখন সেইসব যুগ-মানব "চেতনার পরিমাপ নিতে আসে", তখনই তো আসল পরীক্ষা। আধুনিক সমাজের প্রবণতাসমূহ যেভাবে আধুনিক ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের তৎপরতায় মূল্যবোধে আমূল পরিবর্তন সাধন করতে চায়, তার নিরিখে কবীরের মতো যুগ-মানবদের অনুধাবনের প্রয়োজনও যে রয়ে যেতে পারে ঐশ্বর্যের অনাবৃষ্টির কারণেই আরেক দিক থেকে, তাও নিশ্চয় বোধগম্য হতে অসুবিধে হয় না।

'কবীর ও তাঁর কবিতা' গ্রন্থ প্রণয়নে ভূমিকা, অনূদিত পদাবলি এবং শব্দ-সংকেত সর্বত্রই পরিবর্ধিত হয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে পরিমার্জনও ঘটেছে।

'প্রতিক্ষণ'-এর সম্পাদক স্বপ্না দেব এবং প্রকাশক প্রিয়ব্রত দেব এইসূত্রে আবারও আমাকে কৃতজ্ঞ করলেন।

পত্রিকায় প্রকাশের সময় এবং এই গ্রন্থের প্রস্তুতিপর্বেও, উদারভাবে আমাকে সর্বক্ষণ সাহায্য করে গেছেন অগ্রজ প্রাবন্ধিক অরুণ সেন। সস্নেহ অনুমোদনে যিনি 'প্রতিক্ষণ'-এর সঙ্গে যুক্ত আমার সমস্ত কাজেই বরাবর যথার্থ-অগ্রজের ভূমিকাই পালন করে আসছেন।

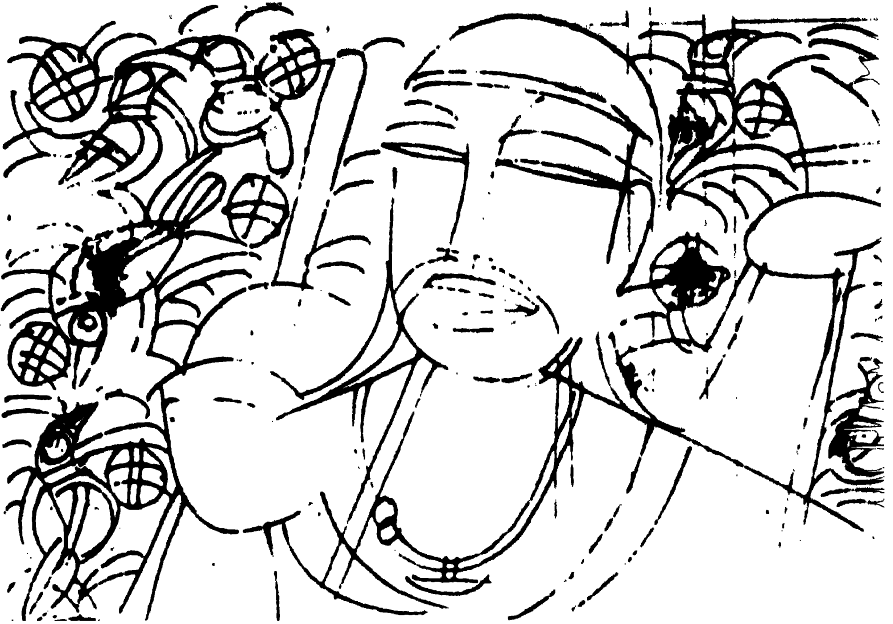
অগ্রজ লেখক দেবেশ রায় এবং কবি ও লোকগানের রসিক রণজিৎ সিংহের স্নেহার্দ্র প্রশ্রয়ও এইসূত্রে স্মরণীয়।

'কবীর ও তাঁর কবিতা' প্রথম প্রকাশের পর যেমন নিজের আগ্রহে ব্যক্তিগত আলোচনায়, এই গ্রন্থের প্রস্তুতির সময়ও তেমনই বিভিন্ন ভাবে সহায়তা করেছেন অগ্রজ তরুণ পাইন। তাঁর সহায়তা না পেলে এই কাজে অগ্রসর হওয়া কঠিন হত।

প্রয়োজনীয় বইপত্র দিয়ে কবি রমা ঘোষ, সোমক দাস, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিজিৎ গোস্বামীও সহায়তা করেছেন। বন্ধু গৌরীশঙ্কর দে ক্ষেত্রবিশেষে বেশকিছু সমস্যার সমাধান করেছে। এঁদের সকলেই

তো এরকম একটি কাজকে যথাযোগ্য মর্যাদায় দেখতে চেয়ে নির্দ্বিধায় আমার প্রয়োজনটুকু মিটিয়েছেন।
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ত্রাণ-কল্যাণ দফতরের অধীন উত্তরপাড়ার সরকারি তাঁতকলের পরিচালন-প্রতিনিধি শম্ভু মিত্র মশায় টানা-পোড়েনের খুঁটিনাটি বিষয়ে আমাকে দীর্ঘসময় নিয়ে না বোঝালে, এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় কবিতা দুটির অনুবাদে সাহস করে অগ্রসর হতাম কি না সন্দেহ। তাঁকে নানা প্রশ্নে ব্যস্ত করে আমার অজ্ঞতাকে কিছুদূর অন্তত কাটাতে পেরেছিলাম।
আমার অগ্রজ এবং শুভানুধ্যায়ী বন্ধুদের কাছে এই অবকাশে কৃতজ্ঞতাটুকু জানানো রইল। তাঁদের আগ্রহ এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহায়তা নিঃসন্দেহে আমাকে প্রেরণা দিয়েছে।
'প্রতিক্ষণ'-এর সঙ্গে যুক্ত থেকে কম্পোজিং, প্রুফ রিডিং এবং আর্ট ওয়ার্কে যেসব অগ্রজপ্রতিম কর্মী এই গ্রন্থকে পাঠকের দরবারে আনতে সাহায্য করলেন, তাঁদেরও বিশেষভাবে স্মরণ করি।
এই গ্রন্থের পাঠ্যবস্তুর অন্তর্গত ভুলত্রুটির দায় আমারই। ত্রুটি নিশ্চয় ইচ্ছাকৃত নয়। হলে তা আমার অজ্ঞানতার কারণে। হয়তো কিছু অনবধানে। জানালে নিশ্চয় উপকৃত হব।

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়



কবীর

সাম্প্রতিকের টানে চৈতন্যস্বরূপ

তোমার পথ ঢাইক্যাছে মন্দিরে মসজিদে।
ও তোর ডাক শুনে সাঁই চলতে না পাই
আমায় রুখে দাঁড়ায় গুরুতে মুরশেদে।।
ডুইব্যা যাতে অঙ্গ জুড়াই
ওরে তাতেই যদি জগৎ পুড়াই
তবে অভেদ-সাধন মরল ভেদে।।
ওরে প্রেম দুয়ারে নানান তালা—
পুরাণ কোরান তসবি মালা—
হায় গুরু, এই বিষম জ্বালা
কাঁইদ্যা মদন মরে খেদে।।

মদন বাউল এই গান দিয়ে তাঁর সাঁই-এর উদ্দেশে যা বলেছেন, পূর্বসূরি কবীর তাঁর জীবৎকালে প্রতিটি ধর্মের প্রাতিষ্ঠানিক রূপকে প্রত্যক্ষ করে এই কথাই আরো তীব্র সমালোচনায় বলে গেছেন। সহজিয়া কবীরের নামোদ্ধৃত অসংখ্য পদে এর প্রমাণ মেলে।

আজ আমাদের দেশ আর কালের পটভূমিতে যখন ধর্মনীতি আর রাজনীতির অভ্যন্তরে সামঞ্জস্যনাশক বিষাক্ত পরিমণ্ডল প্রাণের অপব্যবহারের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হয়ে উঠেছে, তখন স্বভাবতই ভক্ত কবীর এবং তাঁর পূর্বজ ও অনুজ আরো অনেকেই আমাদের যাপনের মূল ধরে গভীরভাবে নাড়া দেন। আমরা আন্দোলিত হই। তাঁদের জীবন আর সাধনার ভেতর দিয়ে তাঁরা কালান্তরে সামঞ্জস্যবিধানের এমনই এক প্রতীক হয়ে উঠেছেন, যার দ্বারা মানুষের শুভংকর সম্ভাবনা প্রচারিত হয়। সর্বমানবীয় সংস্কৃতির দার্শনিক পশ্চাৎভূমি নির্মাণে সময়-তরঙ্গের অধীন তাঁরা এক-একটি তরঙ্গবিশেষ। মানবের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির, সীমার সঙ্গে অসীমের, লোক-লৌকিকের সঙ্গে প্রকৃত ধর্মবোধের সেতুবন্ধনে তাঁদের ভূমিকায় তাঁরা লোকায়ত। জাতিবিদ্বেষ, অস্পৃশ্যতা, ধর্মজ্ঞানহীন বাহ্যাচার, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি, অসদাচার—এর কোনোটাই আমরা কাটিয়ে উঠতে পারি নি। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে কবীরের জীবৎকালের ইহলৌকিক অভিজ্ঞতা তাই আমাদের কালেও তাঁকে প্রাসঙ্গিক করে তুলেছে। কেননা এই সমস্তর বিরুদ্ধেই ছিল তাঁর সাধকজীবনের সংগ্রাম।

সাধারণের ভেতর থেকেও কবীরের মতো মানুষজন অসাধারণ হয়ে ওঠেন বলেই তাঁদের জন্মকাহিনী, ক্রিয়াকর্ম, মৃত্যু সমস্ত কিছুর ওপরই অলৌকিকত্ব আরোপের চেষ্টা হয়। প্রতিটি ধর্মমতাবলম্বী সম্প্রদায়েই এটি এক সাধারণ লক্ষণ। কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের দ্বারা কৃত আচরণীয় মানবধর্ম যখন সাধারণের কাছে গ্রহণীয় করে তোলা হয়, তখন মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কারোর মাধ্যমে তা নির্দেশিত, এই প্রচারের ভেতর নামতে হয় অনুশাসকদের। তাই কোনো গোষ্ঠীর পক্ষে আচরণীয় অনুশাসনের সংকলন গ্রন্থ বা সংবিধানকে অপৌরুষেয়তার দাবিসমেত অসাধারণ ব্যক্তিদেরও অবতার-পয়গম্বর ঈশ্বরের সন্তান ইত্যাদি অভিধায় অভিহিত করে লোকান্তর করে তোলা হয়। ব্যক্তিবিশেষের শক্তির অসাধারণত্ব এভাবেই লোকান্তর হয়ে ধর্ম ব্যবসায়ীর হাতে পানি পাওয়ার উপায় হয়ে ওঠে। গুরু-পুরুত-মোহন্ত-পীর-মুরশেদের হাতে সাধারণ মানুষের নাকাল হওয়া প্রত্যক্ষ করে যাঁরা এই ধর্ম-ব্যবসার বিরুদ্ধে মাথা তোলেন, তাঁদের লাঞ্ছনাও কম জোটে না। কিন্তু তাঁরা অন্তর আর বাইরের ঝঞ্ঝাকে অতিক্রম করতে তাঁদের ব্যক্তিত্বের গঠনে যাকে বিশেষ মূল্য দেন, তা হল: কথা আর কাজের সমন্বয়। মহৎ ব্যক্তিত্ব গঠনে যে ক্যারিজমা সক্রিয় থাকে, তারই গুণে তাঁরা নিজের অস্তিত্বকেও যেমন, তেমনি অপরের অস্তিত্বকেও অর্থময় করে তোলেন। তাই মানবসভ্যতায় এই সাধক প্রকৃতির মানুষদের গুরুত্ব অনুধাবন করা আমাদের কর্তব্যের ভেতরই পড়ে।

ধর্মের নামে রক্তপাত মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে কোনো বিরল ঘটনা নয়। সাকার ভজনা থেকে নিরাকার ভজনায় আসতে যেমন বিপুল রক্তপাত ঘটেছে, তেমনি নিজের ধর্মমতানুগত্যের গোঁড়ামিতে অপর ধর্মমতের প্রতি অসহিষ্ণু দৃষ্টিভঙ্গির কারণেও রক্তপাত হয়ে উঠেছে অনিবার্য। 'ধর্মযুদ্ধ' শব্দটি তাই বিশ্বে অধিকাংশ সভ্যজাতির ইতিহাস-মন্থনে সভ্যতার সংকট বলেই মনে হয়।

যে মাটিতে এই দেহভাণ্ডের সৃষ্টি, সেখানে তো কোনো ভেদ নেই, তাহলে ভাণ্ডে ভেদ আসে কোত্থেকে? এ প্রশ্ন কবীর তুলেছেন। তাই তিনি বলছেন:

> ইম তৌ এক এক করি জাঁনা।
> দোই কহৈ তিনহী কৌ দোজগ জিন নাহিন পহিচানা।।

(দ্র ১১ সংখ্যক অনূদিত পদ)

কিংবা, (ভাইরে) দুই জগদীশ কহাঁতে আয়া কহু কবনে ভরমায়া।
অল্লহ-রাম-করীমা কেসো (হরি) হজরত নাম ধরায়া।।
গহনা এক কনকতেঁ গহনা ইনি মহঁ ভাব ন দুজা।
কহন-সুননকো দুর করি পাপিন ইক নিমাজ ইক পূজা।।
(দ্র ৫৯ সংখ্যক অনূদিত পদ)

এই অবস্থান থেকেই কবীর সমন্বয়ী সহজিয়া চিন্তাধারার অসামান্য প্রতীক হয়ে উঠেছেন। ব্রহ্মা-মহেশ্বর-নিরঞ্জন-আল্লা তাঁর কাছে সব একাকার। তাই হিন্দু-মুসলমান যেমন আলাদা নয়, তেমনি পণ্ডিত-পাঁড়ে অবধূত-যোগী- কাজি-মোল্লা-শাক্ত এরাও প্রত্যেকে ধর্মের নামে নানা বিচ্যুতির কারণে কবীরের দৃষ্টিতে এক। তাঁর বক্তব্য অনুসারে, নেতিবাচকভাবেই এরা সব মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ।

মুসলমান আগমনের পর থেকে ভারতের সনাতন ধর্মকে 'হিন্দু' অভিধায় অভিহিত করার যে অভ্যেস গড়ে উঠতে থাকে, তিনি সেই হিন্দুর দেবতাকে যেমন অনেকান্ত বিভাজনের থেকে একের ঐক্যে দেখতে পেরেছিলেন, তেমনি সেই 'এক'-এর ভেতর আল্লাকেও মিলিত অবস্থায় বৌদ্ধ, নাথ প্রভৃতির ঈশ্বরকেও একরূপে দেখেছিলেন। কবীরের 'রাম' তাই এই সবকিছুর মিলিত একটি ভাব, যা তাঁর পরম, যা তাঁর ঈশ। গুরু রামানন্দের কাছ থেকে প্রাপ্ত 'রামনাম' তাই তাঁর ভক্তমনে ভবসাগর পাড়ি দেবার ভেলা। যাতে অবলীলায় তিনি বহু ঢেউ অতিক্রম করতে পারবেন। তাঁর রাম কোনো অযোধ্যার নয়, তাঁর রাম নিজের অন্তরে থাকা পরম। যে রামের আসন কোনো মন্দিরে নেই, আছে তাঁরই অন্তরে।
কবীর নিজে যেহেতু শ্রমজীবী সমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তাই সেই সমাজের লোকায়ত সুরেই তাঁর ঐক্যের বীণ বাঁধা ছিল। আল্লাহু আকবর, কী হর হর মহাদেব, কী জয় শ্রীরাম মুখে নিয়ে যারা প্রতিপক্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, নিরীহ শান্তিকামী মানুষের জীবন তছনছ করে দেয়, কবীর সেই সমাজের স্বার্থবুদ্ধিকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। করেছিলেন বলেই সমাজের ওপরতলার ধর্মীয় জীবনযাপনের যে রূপটি তাঁর কাছে পরিস্ফুট হয়েছিল, সেই সুবাদেই তিনি প্রতিটি ধর্মের প্রাতিষ্ঠানিকরূপের প্রবল সমালোচনায় মুখর হয়েছিলেন। তাঁর কাছে রাম-আল্লা-অলখ পুরুষ-নিরঞ্জন একাকার হয়েছিল তাঁর সহজ সাধনারই ভিত্তি হিশেবে। সহজের ভেতর তিনি কায়াকে শোধন করে নিতে চেয়েছিলেন এবং তা পেরেছিলেন বলেই বলতে পারেন—

সাধো সহজৈ কায়া সোধো।
জৈসে বটকা বীজ তাহিমেঁ পত্র-ফুল-ফল-ছায়া।
কায়া-মদ্ধে বীজ বিরাজে বীজা-মদ্ধে কায়া।
অগ্নি-পবন-পানী-পিরথি-নভ তা-বিন মিলৈ নাহী।
কাজী পণ্ডিত করো নিরনয় কো ন আপা মাহী।
জল-ভর কুম্ভ জলৈ বিচ ধরিয়া বাহর-ভীতর সোঈ।
উনকো নাম কহনকো নাহী দুজা ধোখা হোঈ।
কহৈ কবীর সুনো ভাঈ সাধো সত্য-শব্দ নিজ সারা।
আপা-মদ্ধে আপৈ বোলে আপৈ সিরজন হারা।।
(দ্র ৯৯ সংখ্যক অনূদিত পদ)

সহজিয়া কবীরের কাছে তাই সংগত কারণেই মনে হয়, যেকথা আমরা অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'-র 'ধূলামন্দির'-এও পেয়ে যাই, তাঁর পরম কোনো দেবস্থানে নেই, আছেন প্রাণের মাঝে। সমস্ত জীবের অন্তরে তাঁর পরমের অবস্থান।

তাই কবীর তাঁর পরমের জবানিতে বলছেন—

মোকো কঁহা ঢুঁঢে বন্দে, মৈঁ তো তেরে পাসমেঁ।
না মৈঁ দেবল না মৈঁ মসজিদ না কাবে কৈলাসমেঁ।
না তো কৌন ক্রিয়া কর্মমেঁ নহী যোগবৈরাগমেঁ।
খোজী হোয় তো তুরতৈ মিলি হৌঁ, পল-ভরকী তালাসমেঁ।।
(দ্র ৩ সংখ্যক অনূদিত পদ)

আর রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—

ভজন পূজন সাধন আরাধনা সমস্ত থাক পড়ে।
রুদ্ধদ্বারে দেবালয়ের কোণে কেন আছিস ওরে!
অন্ধকারে লুকিয়ে আপন-মনে
কাহারে তুই পূজিস সংগোপনে,
নয়ন মেলে দেখ্ দেখি তুই চেয়ে—দেবতা নাই ঘরে।।

প্রকৃতপক্ষে, ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারায় কবীরের ঐতিহাসিক ভূমিকা এইখানেই তাঁর সাম্প্রদায়িক বুদ্ধির ঊর্ধ্বে সর্বমানবীয় চেতনায় সমুজ্জ্বল। প্রেম আর ভক্তিমার্গের সন্ধান দিয়ে কবীর তাঁর সহজ-সাধনে ভারতবর্ষের যুগযুগান্তরের অপেক্ষার পর 'ধূলামন্দির'-এ নিয়ে যেতে পেরেছিলেন, যে উত্তরাধিকার তিনি গুরু রামানন্দের কী একেশ্বরবাদী সাধকদের সূত্রে পেয়েছিলেন। তাঁর মূল সত্য বৌদ্ধদের কাছ থেকেও আহরণে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। ক্ষিতিমোহন সেন লিখেছেন—'মুনি রামসিংহের পাহুড় দোহাতে কবীরের মূল সত্য সবই ভালোভাবে দেওয়া আছে।" ('ভারতের সংস্কৃতি' পৃ ৩৪)

যে সময়ে কবীরের আবির্ভাব, সে বড় বিচিত্র সময়। একদিকে ভারতের সনাতন ধর্ম, অন্যদিকে ইসলাম। ভারতের নিজস্ব ধর্মীয় সম্প্রদায়সমূহের ভেতর ঐক্যের প্রবল অভাব। পাঠান রাজত্বের সুবাদে ইসলামের ভারতবর্ষের মাটিতে দৃঢ়ভিত্তিক প্রতিষ্ঠার প্রতিদ্বন্দ্বীমূলক অবস্থাকে মোকাবিলা করতে গিয়ে স্বভাবতই সমাজকুলপতিদের ধর্মীয় সংহতির দিকে টনক নড়ল। কিন্তু তা ছিল তাঁদের পক্ষে দুঃসমাধেয়। কেননা শাস্ত্রপুঁথির অনুশাসনকে অতিক্রম করে যথার্থ বাস্তবজ্ঞানসম্পন্ন সামঞ্জস্যবোধ গড়ে তুলতে তাঁরা অনেকটাই অকৃতকার্য হয়েছিলেন বলা যায়। ভক্তিপ্রেমরসের ধারা সেখানেই এক সাম্যের ধর্মবোধে সাম্প্রদায়িক বুদ্ধিকে অতিক্রম করে সমাজকে উজ্জীবিত করে তুলতে পারল। বলা বাহুল্য, মানবতন্ত্রী চেতনার উদ্বোধনে এই পথের নির্মাণ একদিনে হয় নি। তেমনি কোনো ব্যক্তিবিশেষের একক প্রচেষ্টাতেই তা সীমাবদ্ধ, এও বলা যায় না। এই পথের সবটাই যে অসংগতিমুক্ত ছিল একথাও জোর দিয়ে বলতে পারা যাবে না। কিন্তু এই জাগরণের ভেতর গতরাত্রির কিছু বৈশিষ্ট্য থাকলেও তা যে প্রকৃতপক্ষে নবজাগরণই হয়েছিল, সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ না রাখাই সংগত হবে।
কবীর এই নবজারণের অন্যতম যুগপুরুষ। বাঙালি জীবনে শ্রীচৈতন্যের যে ভূমিকা, তৎকালীন ভারতের উত্তরাংশে কবীরের ভূমিকাও সেভাবেই স্মরণীয়। কবীর এবং শ্রীচৈতন্য দুজনেই, ইংরেজি শব্দ ধার করে বলা যায়, Cult figure। বস্তুতপক্ষে শ্রীচৈতন্যকে কেন্দ্র করে যেভাবে বাংলায় বৈষ্ণবসাহিত্য গড়ে ওঠে, কবীরকে কেন্দ্র করেও সেভাবেই হিন্দি সাহিত্যের একটা বড় অংশ গড়ে উঠতে থাকে কবীরের মতপুষ্ট তাঁর পরবর্তী পথিকদের কল্যাণে। কবীরের প্রভাব শ্রীচৈতন্যের মতোই জাতীয় জীবনে তাই চিরপ্রণম্য। কবীরের রাম আর শ্রীচৈতন্যের কৃষ্ণ সেদিনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে তাই সত্যে সমুজ্জ্বল। যদিও একথা আমরা ভুলে যাই; কিন্তু

আমাদের বিস্মৃতিপরায়ণতা আর ঐতিহাসিক সত্য যে সমান্তরাল পথের পথিক নয়, তা নিশ্চয় নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

কবীরের জন্মকাহিনী নিয়ে বিচিত্র প্রহেলিকা, গুরু রামানন্দ, কি শেখ তক্কির কাছে তাঁর দীক্ষা গ্রহণের বিসংবাদী তথ্যগুলো থেকে এই বিবেচনায় আসতে অন্তত কোনো অসুবিধে হয় না—হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নীচের মহলের মানুষজনের কাছে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা (উভয় সম্প্রদায়েরই গোঁড়া বিভেদকামী শক্তিগুলির বিরুদ্ধাচরণ ঘটলেও) তাঁকে ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারায় হিন্দু-মুসলমান নামক দুটি সন্নিহিত কোণের মিলনবিন্দু করে তুলেছিল। তাই জাতির নামে বজ্জাতি দেখে তাঁকে বলতে হয়েছিল—

জাতি ন পূছো সাধকী পূছি লীজিয়ে জ্ঞান।
মোল করো তরবারকা পড়া রহন দো ম্যান।।
কিংবা
কাজী তৈ কবন কতেব বখানী।
পঢ়ত পঢ়ত কেতে দিন বীতে গতি একৌ নহি জানী।।
সকতি সনেহ পকরি করি সুনতি মৈ ন বদউংগা ভাঈ।
জৌ রে খুদাই তুরুক মোহি করতা তৌ আপহি কটি কিন জাঈ।।
সুনতি করাই তুরুক জৌ হো না তৌ ঔরতি কৌ কা কহিএ।
অরধ সরীরী নারি ন ছুটৈ তাতে হিন্দু রহিএ।।
(দ্র ৬২ সংখ্যক অনূদিত পদ)

কবীরের এই কথারই প্রতিধ্বনি কি আমরা পেয়ে যাই না লালনের গানে?

সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে,
লালন ভাবে—জাতির কি রূপ দেখলেম না এই নজরে।

কেউ মালা কেউ তজ্বি গলায়
তাইতে যে জাত ভিন্ন বলায়,
যাওয়া কিম্বা আসার বেলায়,
জাতের চিহ্ন রয় কি রে?

যদি ছুন্নত দিলে হয় মোসলমান
নারীর তবে কি হয় বিধান।
বামন চিনি—পৈতা প্রমাণ,
বামনী চিনি কিসে রে?

জগৎ বেড়ে জেতের কথা,
লোকে গৌরব করে যথাতথা,
লালন·সে জেতের ফাতা
বিকাইছে সাত বাজারে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ থাক, লালনের এই গানের বাণীর পাঠান্তরও লক্ষ করা যায়। 'যদি ছুন্নত দিলে হয় মোসলমান'-এর জায়গায় 'খাত্‌না দিলে হয় সলমান'-ও মুদ্রিত হতে দেখা গেছে। এমনকী দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তবকের অবস্থানেও পার্থক্য ঘটেছে। সে যাই হোক, আরেকদিকে তো কবীর-বাণীতেও পেয়ে যাই বৌদ্ধ সহজিয়াদের সন্ধা ভাষায় (যে ভাষা অভিসন্ধিত) লিখিত চর্যাপদের উপস্থিতি। কবীরের নামোদ্ধৃত একটি পদে বলা হয়েছে—

কৈসে নগর করৌ কুটবারী।
মাংসু পসারি গীধ রুখবারী।।
বৈল বিআই গাই ভাই বাঁঝ।
বছরাহি দুহে তীনিউ সাঁঝ।।
মূসা খেবট নাব বিলইয়া।
সোবৈ দাদুর সর্প পহরিয়া।।
নিত উঠি স্যার সিংহ সৌ জুঝে।
কহে কবীর কোঈ বিরলা বুঝে।।

অর্থাৎ,

কেমনে করি নগর কোটালি'
শকুন হল পাহারাদার, মাংস ছড়ালি।
বলদা বিয়োয়, বন্ধ্যা হল গাই,
তিনসন্ধে কেঁড়ে দোয়ায় তাই।
নৌকো বিড়াল, ইঁদুর তাকে বায়,
দাদুরী শোয়, সর্প পাহারায়,
শেয়াল রোজই সিংহের সঙ্গে জোঝে।
কবীর বলে, বিরল কেউ তা বোঝে।

এবার, চর্যাপদটির দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। সেখানে বলা হচ্ছে—

টালত মোর ঘর নাহি পড়িবেশী।
হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী।।
বেঙ্গ সংসার বড়হিল জাঅ।
দুহিল দুধ কি বেন্টে সমাঅ।
বলদ বিআঅল গবিআ বাঁঝে।
পিটা দুহিঅই এ তিনা সাঁঝে।।
জো সো বুধী সো ধনি বুধী।
জো সো চোর সোই সাধী।।
নিতি নিতি সিআলা সিহে সম জুঝঅ।
ঢেণ্ঢণ পাএর গীত বিরলে বুঝঅ।।

অর্থাৎ "টিলার উপরে আমার ঘর, কোনো প্রতিবেশী নাই (গ্রাহ্য-গ্রাহকরূপ দ্বৈতজ্ঞান নাই), হাঁড়িতে (দেহভাণ্ডে) ভাত (সংবৃত্তিবোধিচিত্ত) নাই,—নিত্য আসিতেছে (নৈরাত্মরূপে প্রবেশ করিতেছি)। বেঙের সংসার বাড়িয়াই যাইতেছে; দোহান দুধ (বোধিচিত্ত) কি বাঁটে (মহাসুখ-চক্রে) প্রবেশ করিতেছে? বলদ (চঞ্চল চিত্ত) বিয়াইল, গাভীটা (শূন্যতা দেবী) বাঁঝা; এ-তিন সন্ধ্যায় বলদের পীঠা বা পালান দোহাই। যে বোঝে সে-ই বুদ্ধিমান,—যে চোর (যে চিত্তকে চুরি করে) সেই সাধু। নিত্য নিত্য শিয়ালটা (সংবৃত্তিচিত্ত) সিংহের (পারমার্থিক চিত্তের) সহিত যোঝে,—ঢেণ্ঢণপাদের গীত বিরলে বসিয়া বোঝ।"—(ভারতীয় সাধনার ঐক্য/শ্রী শশিভূষণ দাশগুপ্ত, পৃ ৩৪-৩৫)

শশিভূষণ দাশগুপ্ত এই প্রসঙ্গে লিখেছেন: "উঁচুতেই যে যোগীর আসল বাস তাহা অন্য গানেও বলা হইয়াছে। ঢেণ্ঢণপাদ বলিয়াছেন—'টালত মোর ঘর',—উঁচু 'টিলা'র উপরে হইল আমার আসল ঘর। নিম্নের এই প্রকৃতিদোষকলুষ সংসার-আবর্ত হইতে এই যে উঁচু মাঁচায় উঠিয়া বসা ইহাই বৌদ্ধ সহজিয়াদের উল্টাসাধন। এই উল্টা-সাধন তাঁহারা অনেক সময় প্রকাশও করিয়াছেন তাঁহাদের গানের উল্টা রীতিতে।" (ঐ; পৃ ৩৪)।

হিন্দিতে একেই বলে 'উলটবাঁসিয়া'। উপেন্দ্রকুমার দাস তাঁর 'ভক্ত কবীর' গ্রন্থে লিখেছেন: "আমরা লক্ষ করে এসেছি কবীরের কোনো কোনো পদ সন্ধ্যা ভাষায় রচিত। এই সব পদে এবং অন্যত্রও তিনি কোথাও কোথাও সাংকেতিক শব্দ ব্যবহার করেছেন অথবা বলা যায় পরিচিত সাধারণ শব্দই সাংকেতিক অর্থে ব্যবহার করেছেন। আবার দেখা গেছে এই ধরণের কোনো কোনো পদে তিনি সাধারণ লোকে যা জানে এবং বলে তার উলটো কথা বলেছেন।…এই উলটো কথা হয় বাইরের অর্থ ধরলে, ভিতরের অর্থ ধরলে তা উলটো থাকে না।" (পৃ ১৭০)।

কিন্তু আমাদের খেয়াল রাখতে হয়, কর্মহীন যোগসাধনা কবীরের পথ ছিল না। কবীর বৌদ্ধ সহজিয়াদের, নাথদের কাছ থেকে যে উত্তরাধিকারই বহন করুন-না-কেন, তাঁর সহজসাধনার ভিত্তি কর্মে, ভক্তিতে; এবং তাঁর পরমের প্রতি সুতীব্র আকর্ষণে "বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি" তিনি যোগীদের মতো, অবধূতদের মতো খোঁজেন নি হঠযোগের চর্চায়। তিনি এসব জানতেন। কিন্তু আচার-সর্বস্ব ধর্মসাধনা তাঁর পথ ছিল না বলেই, পরমকে—তাঁর রামকে—তাঁর 'এক'-কে—তাঁর অলখ নিরঞ্জনকে পাবার জন্য ভক্তিমার্গেই তিনি পথিক হয়েছিলেন।

কাশীতে বসবাসের কারণে এবং বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণের দরুণ বিচিত্র সাধু-সন্ত-যোগী-পণ্ডিত-পীর-মুরশিদের সংস্পর্শে তিনি এসেছিলেন। তাঁর কাছে বাহ্যাচার বড় ছিল না তাঁর ঈশকে পাবার উপায় হিশেবে, তাই বাহ্যাচার-সর্বস্ব ভণ্ড তপস্বীদের যেমন তিনি দেখেছেন, সমালোচনায় মুখর হয়েছেন, তেমনি তারই ভেতর কোনো প্রকৃত সাধুকে, যোগীকে প্রত্যক্ষ করলে, তাঁর কাছে পরমের কথা শুনতে যে তিনি আগ্রহী ছিলেন এবং প্রকৃত যোগীপুরুষের স্থান যে তাঁর অন্তরে স্বতন্ত্র আসনেই ছিল, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

শ্রমজীবী সমাজের মানুষ কবীর তাঁর পরমকে পেতে গিয়ে কায়িক শ্রমকে উপেক্ষা করেন নি। তাঁর বাস্তবজ্ঞান তাঁকে এ-কথাই বলতে সাহায্য করেছিল, ক্ষিতিমোহন সেন তাঁর 'ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা' গ্রন্থে যেমন বলেছেন "…তিনি বলিয়াছেন এমন শ্রম করিবে যাহাতে ভিক্ষার উপর নির্ভর না করিয়া নিজের চলে এবং সম্ভব হইলে অপরকেও সহায়তা করা যায়।

কহৈ কবীর অস উদ্যম কী জৈ।
আপ জীয়ে ঔরন কো দী জৈ।।

তাঁর মতে সকলেই উপার্জন করিবে, কেহই অসংগতরূপে সঞ্চয় করিবে না। অর্থ উপার্জন করিয়া লোকসেবায় অর্থস্রোত চলন্ত রাখিলে কোনো বিকার ঘটিতে পারে না।
এই স্রোত বন্ধ হইলেই নানা বিকার ঘটে, নানা দুঃখ ও অন্যায়ের সৃষ্টি হয়। এইসব মতামত লইয়া দাদূ পরে তাঁহার 'ব্রহ্মসম্প্রদায়' স্থাপন করিয়াছিলেন।" (পৃ ৬৮)।

প্রকৃতপক্ষে কবীর এমন এক যুগসন্ধির কেন্দ্রে অবস্থান করছেন, যেখানে হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-জৈন-নাথ ধর্মমতাবলম্বীদের মিলন ঘটেছে যেমন, তেমনি তাঁকে কেন্দ্র করেই শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে সেই ঐক্যের রসধারা বিচিত্রপথে লোকায়ত সাধকদের ভেতর ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁর ঐতিহাসিক গুরুত্ব এই পরিপ্রেক্ষিতে অসামান্য, নিঃসন্দেহে। ক্ষিতিমোহন সেন বলেছেন, "বাংলাদেশের খুসীবিশ্বাসী, সাহেবধনী, রামবল্লভী, জগমোহনী, বলরামী, ন্যাড়া, সহজী, বাউল, দরবেশ, সাঁই, সংযোগী, যদুপতিয়া, কর্তাভজা প্রভৃতি দলের

উপর বাংলা মগধের সহজমত, নাথমত, নিরঞ্জন-মতের প্রভাব যথেষ্ট; মুসলমান ভাব ও সাধনাও অনেকটা আছে। কবীর-দাদূ প্রভৃতির শিক্ষাও কিছু কিছু আসা অসম্ভব নহে।" ('ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা' পৃ ৮৮)।

"কবীর-দাদূ প্রভৃতির শিক্ষা" যে সত্যিই এসেছিল, তার প্রমাণ তো লালনের গানের উদ্ধৃতিতে যেমন দেখতে পাওয়া গেল, মদন বাউলের গানেও তেমনি। যে "অভেদ-সাধন মরল ভেদে" বলে মদন বাউল খেদ করেছিলেন, কবীর তাঁর পূর্বসূরি হিসেবে সেই অভেদ-সাধনের পথে জাতি-ধর্ম-বর্ণগত ভেদবুদ্ধির বিরুদ্ধেই এক মৈত্রীভাবনায়, আমাদের সময়ের মন্দির আর মসজিদের অধিকার নিয়ে রক্তাক্ত, বিষাক্ত পরিমণ্ডলে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠলেন। তাই, কবীর সাম্প্রতিকের টানে চৈতন্যস্বরূপ। 'মন না রাঙিয়ে যোগী রাঙালি কাপড়' বলে যিনি আক্ষেপ করেছিলেন, তিনিই তো বলতে পারেন—

মানবদেহ পেয়েছ বড় কপালগুণে।
এখন খেলা খেলো সব বুঝেশুনে।।

'আমি কাশীর জোলা'

"মৈ কাসী ক জোলহা"—একথা কবীরের আত্মপরিচয় জ্ঞাপনে একটি পদে পাওয়া যায়। এমনকী কবীরের জবানিতে সেখানে এও দেখতে পাওয়া যায়—

> পূরব জনম হম ব্রাহ্মণ হোতে ওছৈ করম তপ হীনা।
> রামদেবকী সেবা চুকা পকরি জুলাহা কীনহা।।

অর্থাৎ, পূর্বজন্মে আমি ব্রাহ্মণ হয়েও তপস্যাহীন ছিলাম, নীচ কর্মে লিপ্ত থেকে রামের সেবা করতে ভুলেছি। তাই আমায় ধরে জোলা করে দিয়েছেন।
এখানেই কবীর এমনও বলছেন—

> তূ ব্রাহ্মণ মৈ কাসী ক জোলহা চীনহি ন মোর গিয়ানা।
> তৈ সব মাগে ভূপতি রাজা মোরে রাম ধিয়ানা।।

অর্থাৎ, তুই ব্রাহ্মণ, আমি কাশীর জোলা। আমার জ্ঞানের পরিচয় তো পেলি না। তোরা সব রাজাদের কাছে হাত পেতেছিস, কিন্তু রামই আমার ধ্যান।

এসব কথা থেকে নিশ্চয় মনে হয়, কবীর বলছেন —জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ হলেই হয় না। ব্রাহ্মণত্ব পাওয়া যায় কর্মের দ্বারা, জ্ঞানের দ্বারা। জোলার ঘরে কবীরের জন্ম ঠিকই, কিন্তু তাঁর জ্ঞান এই যে রাজারাজড়ার কাছে হাত পাতা নয়, সব রাজার যিনি রাজা, কবীরের পরম সেই রামের কাছেই তিনি হাত পেতেছেন। কেননা, এই ভবসাগর রামনামের ভেলায় না চড়লে পাড়ি দেবার উপায় নেই। ভক্তের কাছে পরমের ঐশ্বর্য-প্রাপ্তি ঘটবে এভাবেই, বস্তুজগতের ঐশ্বর্য দিয়ে ভক্তের অভাব পূর্ণ হবার নয়।

কিন্তু, কবীরের এই দার্শনিক প্রজ্ঞা ছাড়া অন্য কিছুর সন্ধান কি এখান থেকে পাওয়া যায় না? ওই 'পূরব জনম হম'-কে যদি একটু অন্যভাবে আমরা দেখতে চাই? যদি মনে হয় তাঁর প্রহেলিকাময় জন্মকাহিনীর কোনো ইঙ্গিত এর ভেতর রয়ে গেছে? হিন্দু-মুসলমান উভয়পক্ষেই কবীরমতের মতাবলম্বী যাঁরা, তাঁদের বিশ্বাস অনুযায়ী কবীরের জন্মকাহিনী ভিন্ন ভিন্ন ধরণের। একপক্ষে, প্রচলিত কাহিনীর আবার রূপভেদও লক্ষ করা যায়। যেমন হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত আখ্যানে জানা যায় রামানন্দের জনৈক ব্রাহ্মণ শিষ্যের বিধবা মেয়ের গর্ভে পুরুষস্পৃষ্ট না হয়েই কবীর জন্মান। কথা এই, ব্রাহ্মণ শিষ্যটি বাল্যবিধবা মেয়েকে নিয়ে একদিন গুরু রামানন্দের দর্শনে এলে মেয়েটিকে তিনি আশীর্বচনে 'সুপুত্রবতী হও', একথা বলেন। তিনি জানতেন না মেয়েটি বিধবা। ব্রাহ্মণ তখন গুরুকে তা জানালে রামানন্দ তাকে অভয় দিয়ে বলেন পুরুষস্পর্শ ব্যতিরেকেই তা সম্ভব হবে এবং সেই সন্তান হাতের তালু দিয়ে ভূমিষ্ঠ হবে। গুরু রামানন্দের কথা অনুযায়ী কবীরের জন্ম সেভাবেই হয়। কিন্তু ভূমিষ্ঠ হবার পর মায়ের কলঙ্কভয়ে পরিত্যক্ত হন। জোলা নিরু আর তার বউ নিমা লহর তালাও-এ পদ্মফুলের ওপর শায়িত শিশুটিকে দেখতে পেয়ে নিয়ে আসে। কবীর তাদের পরিচয়েই জোলার ছেলে হিশেবে পরিচিত হন।

এই গল্পে স্বাভাবিকভাবেই এক কঠিন বাস্তবের সম্মুখীন হতে হয় আমাদের। বিধবা মেয়ের সামাজিক কলঙ্কের কথা বিবেচনা করলে এই আখ্যানে আমরা আনুষঙ্গিক লতাপাতা সরিয়ে এক

বাস্তব অবস্থাকেই প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পাই।

কিন্তু এরই আরেকটি রূপ এরকম— রামানন্দের শিষ্য অষ্টানন্দ স্বর্গ থেকে লহর তালাও-এ, একদিন জ্যোতি নেমে আসতে দেখেন। গুরুকে সেকথা জানালে গুরু রামানন্দ এক মহাপুরুষের আবির্ভাবের কথা বলেন। তারপর কোনো একসময় নিরু আর নিমা যথারীতি কবীরকে উদ্ধার করে লহর তালাও থেকে।

প্রচলিত কাহিনীর এই দুটি রূপভেদ লক্ষ করে মনে হয়, সামাজিক কলঙ্কের কোনো সম্ভাবনা কবীরের জন্মের ক্ষেত্রে থাকার কারণেই দ্বিতীয় আখ্যানের সৃষ্টি হয়ে থাকবে।

কিন্তু আরেক পক্ষ বিশ্বাস করেন, কবীর নিরু আর নিমারই সন্তান। কিন্তু দিব্যজ্যোতিসম্ভূত। কবীরের নামকরণের সময় কাজি এসে কোরান খুলতেই চারটি শব্দ—কবীর, আকবর, কিবরা, কিবরিয়া— দৃষ্টিগোচর হয়। কোরান বন্ধ করে কাজি যতবারই খোলে ততবারই এক কাণ্ড! তাজ্জব কাজি চলে যায়। কিন্তু আবার একদিন এসে পূর্বঘটনার সম্মুখীন হলে রায় দেয়—একে মেরে ফেলা হোক। নিরু তখন কাজির বিচারে শিশুটিকে মারতে গেলে তার বুক থেকে কোনো রক্তই বেরোয় না, উলটে সে দোহা শুনিয়ে বলে তার এই দেহ আলোর, রক্তমাংসের নয়। তখন কাজি বলে—এর নাম হোক 'কবীর' অর্থাৎ মহান।

কোনো সন্দেহ নেই এসব গল্পে কবীরকে লোকোত্তর পুরুষ হিশেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ভক্তদের মনে যুগপুরুষ কবীর দিব্যজ্যোতিস্বরূপ। ঈশ শক্তিরই স্বয়ংপ্রকাশ।

হিন্দু-মুসলমান উভয়পক্ষই কবীরকে যেহেতু নিজেদের লোক মনে করেন, তাই গল্পের প্রকারভেদ ঘটলেও একটি জায়গায় অন্তত মিল—কবীর এই মিলের হোতা এক্ষেত্রে— উভয়পক্ষই তাঁকে অবতার বা পয়গম্বর হিশেবেই দেখতে চেয়েছেন। তবে, মহাপুরুষের জন্ম মুসলমান জোলার ঘরে, এই কথা মানতে কবীরপন্থের হিন্দুপক্ষ রাজি নন। বরং ব্রাহ্মণকুলে জন্মে পরিত্যক্ত হয়েছে মায়ের কলঙ্কের ভয়ে, এরকম একটি কাহিনীকে মেনে নিতে প্রস্তুত! কবীর মুসলমানের ঘরে জন্মেছিলেন— এই তথ্যকে বিকৃত করে পরিবেশন করা হয়েছে, মহাপুরুষের মহাপুরুষত্বের হানিও যাতে না হয়, আবার প্রকৃত তথ্য বেমালুম হজম করেও দেওয়া যায়। অভিপ্রায় যথেষ্ট কূট ছিল তাতে সন্দেহ নেই।

লক্ষণীয়, প্রথম পার্থ কর্ণের জন্মকাহিনীর সঙ্গে কবীরের জন্মকাহিনীর মিল আছে। কিন্তু সত্যকামও তো "ভর্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে" জন্মায়, তার ব্রাহ্মণ হতে তো কোনো অসুবিধে হয় নি! আসলে সেটি ছিল উপনিষদের যুগ; মধ্যযুগে সে প্রত্যাশা করা ভুল হবে। জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ হওয়ার রীতি যেহেতু বহু শতাব্দী আগেই প্রচলিত, তাই উপনিষদের বিচার এখানে খাটে না। ক্ষিতিমোহন সেন ঠিকই বলেছেন,

"সেই যুগের সাধকেরা অনেকেই অতি নিম্নকুলসম্ভূত কিন্তু তাঁহাদের অনুবর্তী সম্প্রদায়গুলি তাঁহাদিগকে অনেক সময় নানা উপায়ে উচ্চজাতীয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। সেইজন্য তাঁহারা সেইসব সাধকদের অনেক বাণী চাপিয়া গিয়াছেন ও অনেক কথা বিকৃত করিয়া বলিতে বাধ্য হইয়াছেন। কবীর, দাদূ প্রভৃতি সাধকেরা কোন বংশে জন্মগ্রহণ করেন তাহা অনুসন্ধান করিলেই এই কথাটি ভাল করিয়া বুঝা যাইবে। কবীর ছিলেন মুসলমান জোলা— সেই কথা কত গল্প দিয়াই আচ্ছাদন করা হইয়াছে।

এখন ইতিহাস আলোচনায় সবই ধরা পড়িয়াছে। তিনি যে মুসলমান জোলার ঘরে জন্মগ্রহণ করেন তাতে আর কোনো সংশয়ই নাই।" তিনি একথাও বলছেন, "সন্দেহ নাই যে কবীর মুসলমান জোলার পুত্র। এই কথাটি গোপন করিবার জন্য ভক্তমাল ও তাহার টীকা হইতে

আরম্ভ করিয়া পরবর্তী সব হিন্দু লেখকই প্রভূত চেষ্টা করিয়াছেন। ...যাক সে কথা, দাদূপন্থের নানা গ্রন্থে এবং আরো বহু বহু সাক্ষ্য অনুসারে ইহা স্পষ্ট বুঝা গিয়াছে কবীর ছিলেন মুসলমান জোলারই ছেলে। ঐতিহাসিক আবুল ফজল ও দবিস্তান বলেন, 'কবীর জোলার বংশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।' তাঁহারা বলেন 'তবু তাঁহাকে ঠিক মুসলমান বলা যায় না, কারণ তিনি মুবহিদ বা ঈশ্বরবিশ্বাসী ভক্ত ছিলেন।"
('ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা'। 'নিবেদন' এবং পৃ ৬৪ দ্রষ্টব্য)

কবীরের জন্মকাহিনীর মতো জন্মস্থান নিয়েও বিসংবাদী তথ্যের অভাব নেই। কেউ বলেন কাশী, কেউ বলেন মগহর-এ, কেউ বা আজমগড়ের বেলাহর গ্রামে। কাশী এবং মগহর কবীরের জন্মস্থান বা কর্মক্ষেত্রের পক্ষে যতখানি বিশ্বাস্য, আজমগড় ততটা নয়। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার কোনো প্রয়োজন নেই। সন্ধানী পাঠকরা ক্ষিতিমোহন সেনের উল্লিখিত গ্রন্থটি এবং প্রভাকর মাচয়ে-র 'কবীর' (প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত বঙ্গানুবাদেও) দেখে নিতে পারেন।

কবীরের জীবৎকালের সাল-তারিখ নিয়েও বিতর্ক। কেউ বলেন তাঁর জন্ম ১৩৯৮ খ্রিস্টাব্দে, মৃত্যু ১৫১৮ খ্রিস্টাব্দে। স্মরণ করা যেতে পারে ১৩৯৮ খ্রিস্টাব্দ তৈমুরলঙের ভারত-অভিযান হিশেবে চিহ্নিত। কবীর নাকি একশো কুড়ি বছর বেঁচেছিলেন। আবার কারোর মতে কবীরের ১৪৯০ খ্রিস্টাব্দে তিরোধান ঘটে। আবার কেউ কেউ ১৪৪০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫১৮ খ্রিস্টাব্দ অবধি কবীরের জীবৎকালের সময়সীমা নির্দেশ করেছেন। তাঁর মৃত্যুকাল আবার ১৪৪৮ খ্রিস্টাব্দেও নির্দেশিত হয়েছে। এইসব হিশেবনিকেশে দেশী-বিদেশী এত বিদগ্ধ ব্যক্তির অভিনিবেশ কাজ করেছে যে এ ব্যাপারে আমাদের পক্ষে সবপক্ষের মতামতেই চোখ বুলিয়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। তবে আমরা এই সিদ্ধান্ত অন্তত করতে পারি, কবীর পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর মানুষ। সিকন্দর লোদি-র রাজত্বকাল ১৪৮৯-১৫১৭ খ্রিস্টাব্দে। কবীর এই সময়ে জীবিত ছিলেন বলে জানা যায় এবং সিকন্দর লোদি ও কবীরকে নিয়ে নানান গালগল্পও আছে। সুতরাং আমরা কবীরকে তাঁর বিতর্কিত ব্যক্তিত্বে ১৩৯৮ থেকে ১৫১৮ খ্রিস্টাব্দ অবধি বিদ্বজ্জনদের বিচিত্র মতামতসহ, কোনো সময়ের ধরে নিতে পারি।

কবীরের জাতিগত ব্যবসা ছিল তাঁত বোনা। শ্রমজীবী সমাজের অন্তর্ভুক্ত কবীর নিজেকে যে কাশীর জোলা বলে পরিচয় দিয়েছেন, সেই জোলা কারা? উপেন্দ্রকুমার দাস তাঁর 'ভক্ত কবীর' গ্রন্থে লিখেছেন— "জোলাহা শব্দটি ফারসি হলেও সংস্কৃত পুরাণে জোলা জাতির উৎপত্তির বিবরণ পাওয়া যায়। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের মতে ম্লেচ্ছ (মুসলমান) পিতা আর কুবিন্দ (শিল্পকার জাতিবিশেষ) মাতা থেকে জোলা জাতির উৎপত্তি হয়েছে। এই পৌরাণিক বিবরণ ঐতিহাসিক বিবরণ নয়। তবে এ থেকে এইটুকু বোঝা যায় যে পুরাণকারের মতে জোলারা মুসলমান শিল্পজীবী জাতি। এইটুকু ইতিহাসসম্মত।...
"ডঃ হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী তাঁর কবীর গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, জোলারা মুসলমান হলেও অন্যান্য মুসলমানদের সঙ্গে এঁদের মৌলিক ভেদ আছে। এঁরা যেখানে থাকেন এক চাপে থাকেন। পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ আর বিহারেই জোলাদের বসতি দেখা যায়। দ্বিবেদীজী বলেন, 'উত্তর-পাঞ্জাব থেকে আরম্ভ করে বঙ্গদেশের (অবিভক্ত বাংলা) ঢাকা বিভাগ পর্যন্ত অর্ধচন্দ্রাকৃতি এক বিস্তীর্ণ ভূভাগে জোলাদের বাস। এই অঞ্চলে এক সময়ে নাথপন্থী যোগীদের অত্যন্ত প্রভাব ছিল। এঁদের অধিকাংশ বাধ্য হয়ে মুসলমান হয়ে যান। এঁরাই জোলা'।" (পৃ ৯)
আর ক্ষিতিমোহন সেন লিখেছেন—

"হিন্দু জোলারাই অনেকে মুসলমান হইয়া গিয়াছিল। এই শ্রেণী হিন্দু সমাজে যেরূপ নিরক্ষর ও অশিক্ষিত ছিল মুসলমান হইয়াও প্রায় সেইরূপই কুসংস্কারাচ্ছন্ন অশিক্ষিত। এমন বংশে ভগবান এত বড় মহাপুরুষের জন্ম দিয়া তাঁহার আপন সত্যের জয়ই ঘোষণা করিলেন।" ('ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা'। পৃ ৬৪)।

এইখানে আমাদের হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদীর বক্তব্য বিস্তৃতভাবে জানা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তিনি 'কবীর' গ্রন্থের 'প্রস্তাবনা' অংশে জানাচ্ছেন— "...মুসলমান আগমনের প্রাক্কালে এদেশে এমন এক শ্রেণী বর্তমান ছিল যারা ব্রাহ্মণদের প্রতি অসন্তুষ্ট তো ছিলই এবং বর্ণাশ্রমের নিয়ম মানতেও প্রস্তুত ছিল না। নাথপন্থী যোগী ছিল এইপ্রকার। রামাই-পণ্ডিতের 'শূন্যপুরাণ'-এর নিরিখে দেখা যায় তান্ত্রিক বৌদ্ধদের এক গোষ্ঠী ওই দীন মুসলমানদের ধর্ম-ঠাকুরকে অবতার বলে বোঝাতে লাগল। তাদের এক্ষেত্রে আশা ছিল যদি আরেকবার বৌদ্ধধর্মের পুনরুদ্ধার সম্ভব হয়। হিন্দু-বিরোধী সমস্ত মতকেই তারা বৌদ্ধ হিশেবে মেনে নিল। যাইহোক, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে ওই দীন নাথ-মতাবলম্বী গৃহস্থ যোগী জাতি বিপুলায়তন ছিল, যারা না হিন্দু, না মুসলমান। এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদাসজীর কাছ থেকে এক প্রণিধানযোগ্য বক্তব্য প্রাপ্ত হই। তিনি জানাচ্ছেন বেনারসের অলইপুরার জোলারা নিজেদের 'গিরস্ত' (গৃহস্থ) বলে। এই শব্দ একথাই জানায়, তাহলে কোনো অগৃহস্থ বা যোগী জোলা জাতিও রয়ে গেছে। বঙ্গের যুগি জাতি এই সম্প্রদায়মূলক জাতিরই ভগ্নাবশেষ। এই সূত্রেই একথা বলতে ইচ্ছে করে কবীরদাস যে জোলা-বংশে পালিত হয়েছিলেন তারা এই ধরণের নাথ-মতাবলম্বী গৃহস্থ যোগীদের মুসলমানী রূপ ছিল।

সর্বপ্রথম লক্ষণীয় বিষয় এই যে কবীরদাস নিজেকে একাধিকবার জোলা হিশেবে পরিচয় দিলেও মুসলমান বলেন নি একবারও। বরাবর তিনি 'না-হিন্দু না-মুসলমান' বলেছেন। আধ্যাত্মিক দিক থেকে নিঃসন্দেহে এটি উচ্চকোটির ভাব হতে পারে। কিন্তু কবীরদাসের এই উচ্চারণে কখনো কখনো এই সন্দেহও উঁকি দিয়ে যায়, আধ্যাত্মিক সত্যের অতিরিক্ত এক সামাজিক তথ্যের ইঙ্গিতও এক্ষেত্রে রয়ে যাচ্ছে। সেকালে বয়নজীবী নাথ-মতাবলম্বী গৃহস্থ যোগীরা বাস্তবিকই 'না-হিন্দু না-মুসলমান' ছিল। কবীরদাস অন্তত পক্ষে একটি পদে স্পষ্টই জানিয়েছেন হিন্দু, মুসলমান, যোগী সব আলাদা, যোগীরা 'গোরখ-গোরখ' বলে, হিন্দু 'রাম-রাম' উচ্চারণ করে আর মুসলমান 'খুদা-খুদা' বলে। [জোগী গোরখ গোরখ করৈ। হিন্দু রাম-নাম উচ্চরৈ।/ মুসলমান কহৈ এক খুদাই। কবীর কো স্বামী ঘটি ঘটি রহো সমাই।।] এক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে বিবেচনা করা দরকার, হিন্দু, যোগী আর মুসলমান বলতে কবীরদাসের বক্তব্য কী ছিল। যেসব ক্ষেত্রে কবীরদাস হিন্দু শব্দ ব্যবহার করেছেন সেসব ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত তিনটি শব্দে তিনটি, দুটি কী একটিই বুঝতে হবে। সেই তিনটি কথা— বেদ, ব্রাহ্মণ আর পৌরাণিক মত। এই তিনকে যে মান্য করে, কবীরদাস তাকেই 'হিন্দু' বলছেন। মুসলমান শব্দের ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। এই শব্দের ক্ষেত্রে কবীরদাস হুবহু সেই অর্থই গ্রহণ করেছেন যা সচরাচর করা হয়ে থাকে। 'হিন্দু' শব্দের ব্যবহার সামগ্রিকভাবে আজকাল সেই সমস্ত ধর্মমতকে গ্রহণ করেই হয়ে থাকে, ভারতবর্ষে যা উদ্ভূত এবং তদনুযায়ী অহিন্দু নয়। কবীরদাস কিন্তু শব্দের এই অর্থ করেন নি।

'যোগী' শব্দটি আরোই অস্পষ্ট। যোগ-ক্রিয়া যিনি করেন তাঁকেই যোগী বলা হয়।... হিন্দুরা ব্রাহ্মণকে শ্রেষ্ঠ এবং পূজনীয় বলে মনে করেন। সন্ন্যাসী এবং যোগীরাও তাঁদের কাছে পূজনীয়। কিন্তু আশ্রম-ভ্রষ্ট যোগী ও সন্ন্যাসী হিন্দু-সমাজে নিকৃষ্ট হিশেবেই প্রতিপন্ন হয়। যদি কোনো সন্ন্যাসী ফের গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করে তাহলে তার সন্ততি অস্পৃশ্য হয়ে যায়। এদেশে সব

হিশেবেই ভ্রষ্ট সন্ন্যাসীদের অনেক জাতি পাওয়া যায়। উত্তর ভারতের গোসাই, বৈরাগী, অতীত, সাধু, যোগী আর ফকির জাতি, তথা দক্ষিণ ভারতের আণ্ডী, দাসরী ও পানিসবন জাতি এবম্প্রকর। যতদিন সন্ন্যাসী নিজের সন্ন্যাসাশ্রমে থাকেন ততদিন হিন্দুর কাছে তিনি পূজ্য, কিন্তু গৃহস্থ হলেই তখন ভ্রষ্ট হিশেবে প্রতিপন্ন হয় মানুষজনের চোখে। গৃহস্থ সন্ন্যাসীর সন্ততি মারফত যে জাতি তৈরি হয়, তখন সমাজের নিচের স্তরেই তার স্থান হয়। এই কারণেই সাধক যোগী আর গৃহস্থ শ্রেণীর যোগীর মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়ে যায়। যোগী জাতি অর্থাৎ আশ্রম-ভ্রষ্ট যোগীদের সন্ততি কোনোভাবেই আশ্রম-ব্যবস্থা, কী বর্ণ-ব্যবস্থা কোনোক্ষেত্রেই অন্তর্ভুক্ত হয় না। আজকাল এইসব জাতির কেউ কেউ নিজেদের 'ব্রাহ্মণ' বলেও অভিহিত করেন। কেউ কেউ আবার ব্রাহ্মণত্বেরও ওপরে নিজেদের রাখতে চান। অতীত জাতির মানুষজন নিজেদের ব্রহ্মার মাথা থেকে উৎপন্ন বলে মনে করেন এবং এক্ষেত্রে আরো এক তর্ক উপস্থিত করেছেন তাঁরা—ব্রাহ্মণ তো উঁচুতেই রয়েছে, কিন্তু ব্রাহ্মণ তো ব্রহ্মার মুখ থেকে উৎপন্ন আর আমরা মাথা থেকে! মাথা নিঃসন্দেহে মুখের চেয়ে উচ্চস্থানেই। কিন্তু এইসব জাতি এককালে আশ্রম-ভ্রষ্ট হওয়ার কারণেই বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থার বাইরেই রয়ে যায়। সর্বগ্রাসী হিন্দু জাতি তাদের সম্পূর্ণরূপেই আত্মসাৎ করে নেয়।

তাছাড়াও এইসব আশ্রম-ভ্রষ্ট জাতির অধিকাংশ আজ পর্যন্ত ভেক ধারণ করে, ভিক্ষে করে জীবন নির্বাহ করে এবং অনেক সামাজিক কৃত্যে গৃহস্থ-ধর্মের নিয়ম বদলে সন্ন্যাসীর পক্ষে আচরণীয় বিধি পালন করে। অনেকেরই মৃতক-সংস্কার হয় না এবং সন্ন্যাসীদের মতো সমাধি হয়ে যায়। বঙ্গদেশে লক্ষ করা গেছে কোথাও কোথাও যোগীদের সমাধি দেওয়া হয় (অর্থাৎ শবকে কবর দেওয়া হয়) এবং কোথাও কোথাও আবার অগ্নি-সংস্কারও করা হয় (অর্থাৎ গৃহস্থ হিন্দুর মতো শব জ্বালিয়ে দেওয়া হয়)। পূর্ববঙ্গ-নিবাসী আমার এক বন্ধু আমায় বলেছেন ত্রিপুরার যোগীরা প্রথমে অগ্নিদাহ করে এবং ফের সমাধি দেয় অর্থাৎ মাটিতে গোর দেয়। কবীরদাসের প্রসঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ একটি ঘটনা এই যে, তাঁর মৃত্যুর পর কিছু ফুল পড়েছিল, যার অর্ধাংশ নিয়ে হিন্দুরা জ্বালায় এবং বাকিটা মুসলমানরা কবর দেয়। কোনো কোনো পণ্ডিত ব্যক্তি একথা নিছক কিংবদন্তী বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আমার অনুমান এই যে, বাস্তবিকই কবীরদাসের ক্ষেত্রে (ত্রিপুরার বর্তমান যোগীদের মতো) সমাধি এবং অগ্নি-সংস্কার এই দুরকম ক্রিয়াই হয়ে থাকবে। যদি এই অনুমান সত্য হয়, তবে দৃঢ়তার সঙ্গেই একথা বলতে পারা যায়, কবীরদাস যে জোলা জাতির মধ্যে পালিত হয়েছিলেন তারা এক-আধ পুরুষ আগের যোগী, যেমন সব আশ্রম-ভ্রষ্ট জাতি মুসলমান হয়েছিল কী হবার অবস্থায় ছিল। যোগী জাতির সম্বন্ধ ছিল নাথপন্থের সঙ্গে। মনে হয় কবীরের বংশেও এই নাথপন্থী সংস্কার পুরো মাত্রায় ছিল। নাথপন্থী সিদ্ধান্ত অবগত না হলে কবীরের বাণী উপলব্ধি করাও মুশকিল।" (পৃ ২৩-২৫)

আর তাই দ্বিবেদীজী এ ব্যাপারে শ্রী আবদুল করিম সম্পাদিত মধ্যযুগের বাঙালি কবি শেখ ফয়জুল্লার 'গোরক্ষ-বিজয়'-এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের অবকাশ রাখেন। কয়েকশো বছর আগে যে যুগিরা বেদ-স্মৃতি-শাসিত হিন্দু-সমাজের বাইরে থেকে, কাপড় বুনে ও বেচে জীবিকা নির্বাহ করত তাদের সামাজিক পুরাণ তাই এক্ষেত্রে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য হয়ে ওঠে। কদলীদেশের প্রসঙ্গে এক যুগিনী গোরক্ষনাথের মন ভোলানোর চেষ্টায় বলে—

"যুগী দ্বারে যুগী যাইবা, অন্ন-জলে তৃপ্তি পাইবা
তাতে আর কিবা আছে কথা!
তুমি-আমি জাতি জন, এক গোত্রে উতপন
তাতে কিছু দোষ নাহি আর।

গড়ুর যুগিয়া তুমি, যোগান যোগিনী আমি
যে থাকে করিমু ব্যবহার।।
সেবিমু যে রাত্রদিন, না জানিএ ভিন্ন-ভিন্ন
যেই আশা আছএ তোমার।
কাটিমু চিকন সুতি, তুমিহ বুনিবা ধুতি
হাটে তে নিবা যে বেচিবার।।
দিনে দিনে বেশি হইব, সম্পত্তি বাড়িয়া যাইব;
দুখি কাথা সব যাইব ছাড়ি।।"

দ্বিবেদীজী এরই নিরিখে বলছেন— "এ থেকে সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে আজ থেকে পাঁচ-ছশো বছর আগে ভারতবর্ষের পূর্বসীমায় যে যোগীরা থাকত, তাদের ঘরবাড়ি ছিল এবং সুতো কাটা ও কাপড় বোনার কাজ করত এবং নিজেদের পৃথক জাতি ও গোত্রে তাদের বিশ্বাস ছিল। এই পুস্তক থেকে এও প্রতিভাত হয় যে মৃত্যুর পর অগ্নি-সংস্কার হত না, বরং সমাধি দেওয়া হত।" তিনি একথাও বলেছেন— "…যে যুগিনীর কথা এখানে বলা হল নিজেকে সে ব্রাহ্মণ যোগিনী এবং নিরামিষাহারী করে তুলল। এইভাবে তারা একটি পৃথক জাতি হয়ে গেলেও বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা এবং অস্পৃশ্য-বিচারের বিরোধীই ছিল। না এদের ভগবানের অবতারে বিশ্বাস ছিল, না কোনো ত্রিদেবে। এদের বাহ্য মৃতসংস্কারেও হিন্দুদের অপেক্ষা মুসলমানদের সঙ্গেই সাযুজ্য বেশি। এইভাবে এরা মুসলমানী ধর্মে আত্ম-সাধর্ম খুঁজে পেল এবং এদের একাংশ ধীরে ধীরে মুসলমান হয়ে গেল। এই ক্রিয়া আজও বর্তমান। আজকাল যোগীদের ভেতর মুসলমান হওয়া কমে গেছে, কারণ তাদের সংঘটিত সভাসমূহ এবং তাদের ঐতিহাসিক জাতি হবার গৌরবপ্রাপ্তি ঘটেছে, কিন্তু কিছুদিন আগেও তারা ধীরে ধীরে মুসলমান হয়েছে।"

এর থেকে দ্বিবেদীজী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন—

১. আজকের বয়নজীবী জাতিগুলোর অধিকাংশই কোনো-না-কোনো সময় ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করত না।

২. যোগী নামে আশ্রম-ভ্রষ্ট গৃহস্থ এক জাতি সারা উত্তর এবং পূর্ব ভারতে ছড়িয়েছিল। এরা ছিল নাথপন্থী, কাপড় বুনে সুতো কেটে গোরখনাথ আর ভর্তৃহরির নাম গেয়ে ভিক্ষে করে জীবনযাপন করত।

৩. এদের ভেতর নিরাকার ভাবের উপাসনা প্রচলিত ছিল। জাতিভেদ এবং ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠতার প্রতি এদের কোনো সহানুভূতি ছিল না এবং অবতারবাদেও কোনো আস্থা ছিল না।

৪. আশপাশের বৃহত্তর হিন্দু-সমাজের দৃষ্টিতে এরা নীচ এবং অস্পৃশ্য ছিল।

৫. মুসলমানরা আসার পর এরা ধীরে ধীরে মুসলমান হতে থাকে।

৬. পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, বিহার এবং বাংলায় এদেরই কোনো বসতি এলাকায় সামগ্রিকভাবে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে।

৭. কবীরদাস এই নতুন ধর্মান্তরিত মানুষজনের মধ্যেই প্রতিপালিত হয়েছিলেন।

এইসবের পরিপ্রেক্ষিতে যদি আমরা কবীরের ওই 'পূরবজনম হম ব্রাহ্মণ হোতে ওছে করম তপ হীনা'-র প্রতি দৃষ্টিপাত করি তাহলে কি বিন্দুর ভেতর সিন্ধু-দর্শনই হয় না?

জোলা কারা এবং জন্মগতসূত্রে কবীর কী ছিলেন এ নিয়ে বিশেষজ্ঞজনদের সিদ্ধান্ত নিশ্চয় আমাদের সংশয়ের অবকাশ ঘটাবে না, আশা করা যায়। কিন্তু প্রশ্ন এই, কবীরের নামোদ্ধৃত পদগুলি তাহলে কার রচনা? জন্ম-পরিচয়ে তিনি জোলা, যে জোলারা আবার নিরক্ষর, অশিক্ষিত, তাঁর পক্ষে কি এসব লেখা সম্ভব? বিশেষত যাঁর নামোদ্ধৃত পদে "মসী কাগদ্ ছুআ নহী" এরকম

কথাও পাওয়া যায়।

কবীর নিজে কিছু না লিখলেও তাঁর বাণী যে শিষ্যদের মাধ্যমে মুখে মুখে প্রচারিত হয়েছিল এ বিষয়ে কোনো সন্দেহের কারণ নেই। কবীরের মতো আরো অনেক সাধকই নিরক্ষর ছিলেন, কিন্তু গুরুর কাছ থেকে যে শিক্ষা তাঁরা পেয়েছেন, যে তত্ত্বজ্ঞান তাঁদের হয়েছে, তার কোনো তুলনা হয় না তথাকথিত পণ্ডিতদের সঙ্গে। কবীরের নামে যা প্রচলিত, তার কোনটা কবীরের আর কোনটা নয়— এসবের বিচার-বিবেচনা সেইসব অনুধ্যানী মানুষজনের পক্ষেই সম্ভব যাঁরা এ ব্যাপারে স্বাধ্যায় গবেষণায় নিযুক্ত। তবে ভেজাল যে চেনা যায় অনেক সময়, একথা ঠিক। ভাষার পার্থক্য নির্ণয়কারী সময় অনেক ক্ষেত্রেই সহায়কের ভূমিকা নেয়। কিন্তু কোনটি কবীরের নিজস্ব পদ আর কোনটি শিষ্য-প্রশিষ্যবর্গের তা নির্ণয় করা অসম্ভব না হোক, যথেষ্ট দুরূহ। লোকমুখে তাঁর আসল রচনার সঙ্গে নকল মিলেমিশে একাকার। আর তাছাড়া ভারতের প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী গুরুর নামে শিষ্যের পদ-রচনা একটি সাধারণরীতি যেখানে, সেখানে একাজ আরো কঠিন। কবীরের মতে প্রভাবিত বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ও অনেক সময় তাঁদের মতানুযায়ী বাণী কবীরের নামে প্রচার করেছে। কবীরের বাণীর সংকলন তাই কবীরের পরবর্তী বা সমসাময়িকালে কিছু কিছু ঘটে থাকলেও, বৃহৎ অংশই কবীরপন্থের পথিকদের।

পরমসন্ধানী কবীর তাঁর জাতিগত ব্যবসার ক্ষেত্রে সবসময় যে খুব মনোযোগী ছিলেন এমন বলা যায় না। কেননা একটি পদে এরকম কথা পাওয়া যায়—

মুসি মুসি রোঁবে কবীর কী মায়।
ঐ বারক কৈসে জীবহি রঘুরায়।।
তননা বুননা সম তজ্যো হৈ কবীর।
হরি কা নাম লিখি লিয়ো শরীর।।

কবীর কাপড় বোনা ছেড়ে নিজের শরীরে লিখেছে হরির নাম, তাই কবীরের মা কেঁদে বলছেন, কেমন করে বাঁচব, হে রঘুরায়। এই সূত্রেই বর্তমান গ্রন্থের অনূদিত পদ ১ ও ২ দ্রষ্টব্য। এহেন কবীর কতদূর সংসারী ছিলেন সে বিষয়ে সংশয় থেকেই যায়। তাঁর বিয়ে সংসার এসব নিয়েও নানা বিতর্ক রয়েছে। কেউ বলেন তিনি বিয়ে করেছিলেন এবং তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল লুই। এমনকী কামাল ও কামালী নামে তাঁর দুই ছেলেমেয়েও নাকি ছিল? ক্ষিতিমোহন সেন 'ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা'-য় জানিয়েছেন— "কবীরের কন্যা কামালীর সঙ্গে একজন ব্রাহ্মণের বিবাহ হয়।" (পৃ ৬৬) কিন্তু কামাল যে কিছুটা বিতর্কিত হয়েছিলেন নানা কারণে, বিভিন্ন সূত্রে তা অনুমান করা যায়। উপেন্দ্রকুমার দাস তাঁর 'ভক্ত কবীর' গ্রন্থে লিখছেন— "...কিন্তু অনেকে মনে করেন পুত্রকে নিয়েও কবীরের অশান্তি ছিল। হিন্দিতে একটি প্রচলিত কথা আছে—

"ডুবা বংশ কবীরকা, জো উপজা পুত কমাল।
হরিকা সুমিরন ছাড়ি কে, ঘর লে আয়া মাল।।"

অর্থাৎ, পুত্র কামালের জন্ম হওয়ায় ডুবল কবীরের বংশ। হরির স্মরণ ছেড়ে দিয়ে ঘরে এল ধন সম্পদ।

এ থেকে অনুমান করা যায় পিতার পথ থেকে পুত্রের পথ ভিন্ন ছিল। পুত্র পিতার আধ্যাত্মিক সাধনা গ্রহণ করেন নি। কারো কারো মতে কামাল বড় হয়ে পিতার মতের বিরোধিতা করেন। কেউ কেউ অবশ্য এসব কথা বিশ্বাস করেন না। পূর্বোক্ত দোহাটিরও তাঁরা অন্য রকম ব্যাখ্যা করেন। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী বলেন, "কমাল একজন ভক্ত ও গভীর চিন্তাশীল সাধক ছিলেন। কবীরের মৃত্যুর পর যখন কামালকে সবাই বলিল, তুমি তোমার পিতার শিষ্যদের লইয়া সম্প্রদায় গড়িয়া তোলো। তখন কামাল বলিলেন, আমার পিতা চিরজীবন ছিলেন সম্প্রদায়ের

বিরুদ্ধে আর আমিই যদি সম্প্রদায় স্থাপন করি তবে পিতার সত্তাকে হত্যা করা হইবে। ইহা একপ্রকার পিতৃহত্যা। সে কাজ আমার দ্বারা সম্ভব হইবে না। তখন অনেকে বলিলেন, 'ডুবা বংশ কবীরকা জো উপজা পুত্র কমাল'।" বলাবাহুল্য উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে এ সম্বন্ধে নিশ্চয় করে কিছু বলা যায় না।" (পৃ ১৪-১৫)

কামালকে কেন্দ্র করে বিতর্ক, মনে হয়, কবীর এবং কবীরপন্থের বিরোধাভাসই ফুটিয়ে তোলে। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম আর ব্যক্তির নিজস্ব ধর্ম-জিজ্ঞাসার দ্বন্দ্ব এক ব্যাপার। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের বিরোধিতা করে আত্ম-ধর্মের উদ্বোধনে যখন ব্যক্তি নিজেই ধীরে ধীরে এক প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠেন তখন সেই ব্যক্তি-প্রাতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে আরো সংগঠন আরো সব প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতেও নিশ্চয় দেরি হয় না। কবীরের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। কবীরের নিজস্ব ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস যা অনুমোদন করে নি, কবীরপন্থীদের বিভিন্ন কার্যাবলিই কি তাকে সম্যক মর্যাদা দিয়েছে? মূর্তিপুজো, বলি এসবের তো বিরোধী ছিলেন কবীর। কিন্তু এসবের সংক্রমণথেকেও কবীরপন্থীরা নিজেদের মুক্ত রাখতে পারে নি। কবীর জাতিভেদ মানতেন না, ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠতাও নয়। এসবের বিরুদ্ধে তাঁর অবস্থান অত্যন্ত কঠোর ছিল। কিন্তু কবীরপন্থীরা এসবও মানেন। শুধু তাই নয়, পন্থের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোও ব্রাহ্মণ আধিকারিকদের দখলে থাকে। তাঁর সাধক-জীবনের সংগ্রামে যেসব বিষয়কে তিনি আঘাত করেছেন, তাঁর মৃত্যুর পর থেকে আজ পর্যন্ত এমন বহু কিছুই পন্থে অনুসৃত হয়ে আসছে যা কোনোভাবেই সেই সাধক-সংগ্রামীর বিশ্বাসকে মর্যাদা দেয় না।

কবীর নাথপন্থী মতবাদের প্রভাবে পুষ্ট যে জোলা পরিবারে পালিত হয়েছিলেন এবং বৈষব গুরু রামানন্দ কী সুফিদের সুরবর্দি শাখার অন্তর্ভুক্ত শেখ তক্কির প্রভাবে যেসব শিক্ষা পেয়েছিলেন, তাঁর আত্ম-ধর্ম উদ্বোধনে সেসবের ভূমিকা নিশ্চয় গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু কবীরপন্থে যাঁরা যোগ দিয়েছেন তাঁরা তো বিভিন্ন জাতের মানুষ এবং অধিকাংশই হিন্দু সমাজের নিম্নবর্গের। তাঁদের হাড়মজ্জায় মিশে থাকা নিজেদের জাতের ধ্যান-ধারণা আচার-অনুষ্ঠান সবকিছুই, পন্থে যোগ দেবার পরেও যায় নি। যাবতীয় পূর্বসংস্কার পন্থে যুক্ত হবার পরেও বজায় থাকার দরুণ কবীরের আদর্শ আর পন্থীদের মধ্যে ব্যবধান হয়ে ওঠে বিস্তর।

শুধু কবীরপন্থীদের ক্ষেত্রেই নয়। অন্যান্য ক্ষেত্রেও তা দেখা যায়। মূল আদর্শ এবং ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগের দিকটি বহু ক্ষেত্রেই ভিন্ন হয়ে থাকে। আদর্শ এক আর ব্যবহারিক জীবনে তার প্রয়োগের কথা আরেক হয়ে ওঠে বলেই অ-সাধারণ কবীরের আত্ম-ধর্ম আর সাধারণ কবীরপন্থীদের আচরণের মধ্যে সেতুবন্ধন সম্ভব হয় না।

প্রসঙ্গসূত্রেই এখানে আমরা ভেবে দেখতে পারি ধর্মান্তরিত সেইসব মানুষজনের কথা। যাঁরা বিভিন্ন সামাজিক চাপে কোনো-না-কোনো সময়ে ধর্মান্তরিত হলেও পূর্বসংস্কার কাটিয়ে উঠতে পারেন নি তো বটেই, উপরন্তু সেই সংস্কারের বশেই নতুন ধর্মে এসে তার আদর্শের পরিপন্থী আচরণই করেছেন। এখানে আমরা 'কদম রসুল'-এর প্রসঙ্গ স্মরণ করতে পারি। যাঁরা প্রাচীন গৌড়ের ঐতিহাসিক স্মারকগুলো দেখেছেন, নিশ্চয় এ বিষটি তাঁদের জানা। পয়গম্বরের পদচিহ্নিত বলে যে পাথরটিকে রেশমী কাপড়ে ঢেকে ধূপ জ্বেলে শুদ্ধাচারে রাখা হয় তা কি মূর্তিপুজো থেকে খুব কিছু আলাদা? কিন্তু চার-সাড়ে চারশো বছর ধরে পুরুষানুক্রমে এই বিশ্বাস যে বেশ কিছু মানুষের মনে গড়ে উঠেছে তার পেছনেও তো ধর্মান্তরিত মানুষজনের সেই পূর্বসংস্কারই সক্রিয় ছিল।

কবীরপন্থীদের ভেতরেও দেখা যায়, অতি সাধারণ, শিক্ষা-দীক্ষাও তেমন কিছু নেই যাঁদের,

'বীজক' গ্রন্থটিকে তাঁরা পুজো করেন। আবার শিক্ষা-দীক্ষায় আলোকিত মানুষজনও কবীরের খড়ম কী কোনো ব্যবহৃত সামগ্রী পুজো করতে কুণ্ঠিত নন। প্রতীক পুজো এভাবেই চলতে থাকে।
প্রকৃতপক্ষে এই সবকিছুই হিন্দুধর্মের সংক্রমণ। যেসব মানুষ পন্থে যুক্ত হয়েছেন তাঁদের জাতধর্মের নিজস্ব সংস্কার এবং পন্থের নিয়ম-রীতির সংমিশ্রণে গড়ে তুলেছেন এক লোকধর্ম। যা নিরাকার ভাবের সাধক অ-সাধারণ কবীরের মূল আদর্শের থেকে আলাদা। হয়তো ভারতবর্ষের মাটির বৈশিষ্ট্যেই এই লোকধর্মও শেষ অবধি সর্বগ্রাসী হিন্দু ধর্মেরই প্রত্যঙ্গ হয়ে ওঠে মাত্র।

যাইহোক, কবীর-সম্পর্কিত যাবতীয় বিতর্কিত তথ্যের ভেতর আরো একটি হল, কেউ কেউ বলেন, কবীরের দুজন বউ ছিল। লুই ছাড়া অপরজনের নাম ধনিয়া বা রমজনিয়া। প্রভাকর মাচয়ে তাঁর 'কবীর' গ্রন্থে জানিয়েছেন—
"ডক্টর রামকুমার বর্মা, তাঁর মতানুযায়ী কবীরের রচনাবলির ভিতরের প্রমাণকে ভিত্তি করে একটা সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত করেছেন যে, কবীরের দুজন স্ত্রী ছিলেন। একজন কুৎসিত এবং একজন সুন্দরী। তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম ছিল ধনিয়া বা রমজনিয়া। যেহেতু শেষোক্ত নামটি নাচ-ওয়ালী মেয়েদের মিষ্টি করে ডাকতে ব্যবহৃত হয় সেইজন্য ডক্টর বর্মা অনুমান করেছেন কবীরের এই দ্বিতীয় স্ত্রী সম্ভবত একজন পতিতা নারী ছিলেন। বলা বাহুল্য, ওই সিদ্ধান্ত কবীরপন্থীদের দ্বারা গৃহীত হয় নি, এবং বস্তুত তাঁদের ক্রোধের কারণ হয়েছে।" (পৃ ৫)।

দেখতে পাওয়া যাচ্ছে কবীরের জীবনকাহিনী নিয়ে অবিসংবাদী তথ্য কোনোটাই নয়। সাধক কবীর দেহত্যাগ করবার সময় কাশী ছেড়ে মগহর-এ যান। গোরখপুরের কাছে এই মগহর-এ কবীরের মৃত্যু হয়। কাশী ছেড়ে মগহর-এ যাবার পেছনে কবীরের বক্তব্য এই যে স্থানবিশেষের মাহাত্ম্য বলে কিছু নেই, কাশীতে মৃত্যু হলে স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটবে আর অন্য কোথাও হলে তা হবে না, একথা ঠিক নয়। অন্তরে যার রামের আসন পাতা, সে যেখানেই থাক না কেন, সেখানেই তার মুক্তি। তাই তিনি বলছেন—

লোকা মতিকে ভোরা রে।
জো কাসী তন উজে কবীরা তৌ রামহি কহা নিহোরা রে।
তব হম বৈসে অব হম ঐসে ইহে জনমকা লাহা রে।।
রাম-ভগতি-পরি জাকৌ হিত চিত তাকৌ অচিরজ কাহা রে।
গুরু-প্রসাদ সাধকী সংগতি জগ জীতে জাই জুলাহা রে।
কহে কবীর সুনহু রে সন্তো ভ্রমি পরে জিনি কোঈ রে।
জস কাসী তস মগহর ঊষর হিরদৈ রাম সতি হোঈ রে।।

মগহর-এ কবীর দেহত্যাগ করবেন শুনে তাঁর ভক্তরা জড়ো হয়। একপক্ষ হিন্দু, অপরপক্ষ মুসলমান। উভয়পক্ষেই রাজপুরুষরাও উপস্থিত। একদিকে রাজা বীরসিংহ, অন্যদিকে বিজলী খাঁ। লোকলস্কর, সৈন্যসামন্তে ছয়লাপ।
অমী নদীর তীরে এক সাধকের কুটীরে কবীর প্রবেশ করলেন। শিষ্যদের কাছে দুটি শাদা চাদর আর পদ্মফুল চাইলেন। এনেও দেওয়া হল। দেহত্যাগের সময় উপস্থিত হলে সকলকে বললেন যেন ভিড় না করা হয়, কেননা তিনি ঘুমোবেন। তাঁর কথা শুনে রাজা বীরসিংহ গুরুর কাছে এই ভিক্ষা করল, যেন মৃত্যুর পর তাঁকে কাশীতে দাহ করার অধিকার গুরু দেন। বিজলী খাঁ তার

প্রতিবাদ করে বলল, মুসলমান-মতে গুরুকে কবর দেওয়া হবে। শিষ্যদের বিবাদ দেখে কবীর বুঝলেন হিন্দু-মুসলমানের রক্তারক্তি অনিবার্য হয়ে উঠবে তাঁর দেহ নিয়ে। উভয়পক্ষকেই শাসন করলেন এই বলে, যেন কোনোভাবেই কেউ অস্ত্র না ধরে আর কোনোরকম গণ্ডগোল না করে এ নিয়ে।
কবীর শিষ্যদের বাইরে যেতে নির্দেশ দিয়ে ঘুমোলেন। দরজা বন্ধ। কিছুক্ষণ পর দরজা খোলা হল। দেখা গেল দুটি চাদর আলাদা আলাদাভাবে পাতা রয়েছে, প্রতিটি চাদরের ওপর সেই পদ্মফুল। কিন্তু ঘরের ভেতর কোনো দেহ নেই।
একপক্ষ সেই পদ্মফুল কাশীতে এনে দাহ করল, অন্যপক্ষ মগহর-এ তার প্রাপ্ত অংশ কবর দিল।
হিন্দুর হিন্দুয়ানি আর তুর্কির তুর্কিয়ানা দেখে যিনি বলেছিলেন—"আরে ইন দুন রাহ ন পাঙ্গি", সেই মহান ব্যক্তিত্ব কবীর এইভাবেই তাঁর জীবনের শেষমুহূর্তেও উভয়পক্ষকে রক্তপাত থেকে নিরস্ত হওয়ার ঐকান্তিক চেষ্টা করে গেছেন হয়তো। এই কাহিনীর সত্যাসত্য নির্ণয় করা অসম্ভব। কবীরের জীবনব্যাপী সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বিভিন্ন পদের বক্তব্য হৃদয়ঙ্গম করলে এই আখ্যানের অন্তর্নিহিত সত্যকেও নিশ্চয় উপলব্ধি করা যায়।
কিন্তু আমরা আগেই দেখেছি দ্বিবেদীজী এই ঘটনার অন্যতর এক ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। ত্রিপুরার যুগিদের মৃতসৎকার সম্পর্কে তাঁর পূর্ববঙ্গবাসী বন্ধুর কাছ থেকে যা শুনেছিলেন, সেইসূত্রেই তিনি এই ঘটনাকে অন্যতর দৃষ্টিকোণে তৎকালীন যুগিদের নিজস্ব আচার-অনুষ্ঠানের নিরিখেই ভাবতে চেয়েছেন।
অন্যদিকে আবার ক্ষিতিমোহন সেনের বক্তব্য—"এই দেহ লইয়া বিবাদ কেন হইল বুঝা যায় না। কারণ হিন্দু শাস্ত্রানুসারেও তো সাধকের দেহ দাহ করার নিয়ম নাই।" ('ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা' পৃ ৬৭)
কবীরের দেহাবশেষ নিয়ে একপক্ষ কাশীতে 'কবীর-চৌরা'য় এবং অন্যপক্ষ মগহর-এ অমী নদীর তীরে সমাধি-মন্দির নির্মাণ করে। ক্ষিতিমোহন সেন লিখছেন—
"...ডাক্তার ফ্যুরের (Führer) লিখিত 'উত্তর পশ্চিম-প্রদেশ ও অযোধ্যার স্থাপত্যকীর্তি ও শিল্পলেখমালা' (Monumental Antiquities and Inscriptions in the North-Western Provinces and Oudh) গ্রন্থে আছে যে বস্তী জেলার অন্তর্গত খিরনী নগরের পূর্বভাগে অমী নদীর তীরে বিজলী খাঁর স্থাপিত কবীরের একটি রৌজা পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে স্থাপনের তারিখ আছে ১৪৫০ খ্রিস্টাব্দ। আবার ১৫৬৭ খ্রিস্টাব্দে নবাব ফিদই খাঁ রৌজাটি সংস্কার করিয়া দেন। কাজেই ভারত ব্রাহ্মণের লিখিত ১৪৪৮ খ্রিস্টাব্দে কবীরের মৃত্যুই প্রামাণ্য। মৃত্যুর দুই বৎসর পরেই রৌজা স্থাপিত হয় এবং বিজলী খাঁ-ই ইহার দুই বৎসর পূর্বে কবীরের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে মগহরে কবীরের সমাধি-মন্দির প্রস্তুত করেন। মুসলমান সাধকদের চিত্তের উপর কবীরের কতখানি প্রভাব ছিল তাহা এই ঘটনা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।" (ঐ)

কবীরের মৃত্যুর পর কবীরপন্থের সৃষ্টি। কবীরের মতো ব্যক্তিত্বের পক্ষে যে কোনো সম্প্রদায় গঠন করা সম্ভব ছিল না, এটুকু উপলব্ধি করা আমাদের পক্ষে অন্তত অসম্ভব নয়। কবীরের নামে চিহ্নিত এই পন্থের প্রধানত দুটি শাখা। একটি কাশীতে, অপরটি মধ্যপ্রদেশের ছত্তিশগড়ে। এছাড়াও বিহারে ধনৌতি শাখা নামে আরেকটি শাখা আছে।যার প্রতিষ্ঠাতা ভগবানদাস। কাশীর 'বাপ' শাখা এবং ছত্তিশগড়ে 'মাঈ' শাখা। কবীর-বাণীর যে সংকলন 'বীজক' নামে প্রসিদ্ধ

তাকেই অবলম্বন করে কাশীতে সুরতগোপাল দাস এই শাখার প্রতিষ্ঠা করেন। কবীরের এক বানিয়া শিষ্য ধরমদাস ছত্তিশগড়ের শাখার প্রতিষ্ঠাতা। ক্ষিতিমোহন সেন লিখছেন সুরতগোপাল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কাশীর শাখা "ক্রমে ক্রমে শাস্ত্রের দিকে ও বিশেষত বেদান্তাদির দিকে ঝুকিতে লাগিলেন। এই বীজকের বিখ্যাত টীকাকার বঘেলখণ্ডের রাজা বিশ্বনাথ সিংজী। তাঁহার কৃত টীকার নাম বঘেলখণ্ডী টীকা।" আর ধরমদাস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ছত্তিশগড়ের সম্প্রদায়ীরা কবীর-সাগর ও অন্যান্য সংগ্রহ এবং বীজকের ত্রিজ্যা টীকার সমাদর করেন। (ঐ)

তবে ধরমদাস কবীরের সাক্ষাৎ শিষ্য কিনা সে ব্যাপারে হয়তো সন্দেহের অবকাশ আছে। উপেন্দ্রকুমার দাস জানাচ্ছেন—"কেননা, ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে কবীরদাসের তিরোভাব হয় আর ধরমদাস গদিতে বসেন সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে (আনুমানিক ১৬১৯ খ্রিঃ)। কাজেই, অনুমান করা যায় ধরমদাস কবীরপন্থী কোনো গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে পন্থে যোগ দেন এবং পরে স্বয়ং একটি শাখা স্থাপন করেন। মনে হয় তাঁর শিষ্যরা গুরুর গৌরব বাড়াবার জন্য তিনি কবীরদাসের সাক্ষাৎ শিষ্য ছিলেন—এই কাহিনী রচনা করেন।" ('ভক্ত কবীর' পৃ ১৪০—৪১) 'এই কাহিনী' বলতে ধরমদাসের সম্পর্কে প্রচলিত একটি গল্পের কথা বলা হচ্ছে। ধরমদাসের আসল নাম ছিল নাকি যুড়াওন। কবীরের শিষ্য হবার পর নাম বদলে ধরমদাস হন। কিংবদন্তী বলে, ধরমদাসকে নাকি কবীর দেহত্যাগের পর দেখা দেন। তাঁকে পন্থ গঠনের নির্দেশ দেন। শুধু তাই নয়, কীভাবে ধরমদাস তা পরিচালনা করবেন সেসব ব্যাপারেও নাকি কবীর তাকে উপদেশ দেন।
এই ধরণের গল্প প্রবাদ হিশেবেই গ্রহণ করা নিশ্চয় সমীচীন হবে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও ধরমদাস যে কবীরপন্থের একজন সংগঠক ছিলেন এবং পন্থের উন্নতির ক্ষেত্রে তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টা যে বিশেষভাবে স্মরণীয়, এমনকী কবীরপন্থীদের সাহিত্য সৃষ্টিতে যে গৌরবময় ভূমিকাও রয়ে গেছে তাঁর, সে ব্যাপারে ঐতিহাসিক প্রমাণাদির অভাব নেই।

এখানে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতেই পারে, নিজে কোনো সম্প্রদায় সৃষ্টির ব্যাপারে কবীর যখন বিরোধী মনোভাবই পোষণ করতেন, তাঁর পক্ষে কি কাউকে দীক্ষা দিয়ে সাক্ষাৎ শিষ্য তৈরি করা সম্ভব? দ্বিবেদীজী লিখছেন—"বাহ্যাচারের নিরর্থক পূজা আর সংস্কারের বিচারহীন গোলামি কবীর আদৌ পছন্দ করতেন না। তিনি মুক্ত মনুষ্যত্বকেই প্রেম ভক্তির পাত্র মনে করতেন। ধর্ম-বিশেষের প্রতি সহনশীলতা এবং সম্ভ্রমের ভাবও তাঁর পদে পাওয়া যায় না। কিন্তু তিনি মানুষমাত্রেই সমমর্যাদার অধিকারী বলে মনে করতেন; জাতিগত, বংশগত, প্রথাগত শ্রেষ্ঠতার কোনো মূল্যই তাঁর কাছে বিবেচিত হত না। সম্প্রদায়-প্রতিষ্ঠারও বিরোধী ছিলেন তিনি। কিন্তু এক বিরোধাভাস এই যে তাঁকে হাজার হাজার লোকে সম্প্রদায়-বিশেষের প্রবর্তক ভেবে নিয়ে গৌরব অনুভব করে!" ('কবীর' পৃ ১৮৬-৮৭) এহেন কবীর কি কাউকে শিষ্য করার জন্য দীক্ষা দিতেন, এই প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ে। উপেন্দ্রকুমার দাস এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য মত ব্যক্ত করেছেন। তিনি জানাচ্ছেন— "অনেকে তো এমন কথাও বলেন যে কবীর কাউকে দীক্ষা দিয়ে শিষ্যও করেন নি। একথা যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। কেননা, শাস্ত্রে স্মার্তী, মানসিকী, যৌগী, চাক্ষুষী, স্পার্শনী, বাচিকী, মান্ত্রিকী, হৌত্রী, শাস্ত্রী, অভিষেচিকী প্রভৃতি বিবিধ দীক্ষার বিধান আছে। সিদ্ধ গুরু শিষ্যকে এর যে-কোনো দীক্ষা দিতে পারেন। কবীর ছিলেন সিদ্ধ গুরু। যদি তর্কের খাতিরে মেনে নেওয়া যায় যে তিনি কারো কানে মন্ত্র দেন নি, তবু তা দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়না যে তিনি দীক্ষা দেন নি। চাক্ষুষী, স্পার্শনী প্রভৃতি দীক্ষা তিনি অনায়াসে দিতে

পারতেন এবং সম্ভবত তাই দিয়েছেন। তাঁর বহুসংখ্যক শিষ্যের কথা কেউ অস্বীকার করেন না। এঁরা কেউই তাঁর কাছে দীক্ষা পান নি এরূপ মনে করার কোনো সংগত কারণ নেই।" ('ভক্ত কবীর' পৃ ১৩৮)

এখানে আমরা স্মরণ করতে পারি, গুরু রামানন্দের কাছে কবীরের দীক্ষাপ্রাপ্তি ব্যাপারেও একই রকম বিতর্ক রয়ে গেছে। এ বিষয়ে যে গল্পটি রয়েছে তা এরকম—রামানন্দের কাছে দীক্ষাপ্রাপ্তির ব্যাপারে কবীর নাকি উৎসুক ছিলেন খুবই। কিন্তু কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছিলেন না। ভেবে চিন্তে অবশেষে কবীর এক কৌশল বের করলেন। প্রত্যেক দিন শেষ রাতে রামানন্দ গঙ্গাস্নানে যেতেন। কবীর নাকি কাশীর স্নানের ঘাটের সিঁড়িতে অন্ধকারে পড়ে থেকে রামানন্দের আসার অপেক্ষা করছিলেন একদিন। গুরু রামানন্দ যখন সিঁড়ি দিয়ে নামছেন সেই সময় কবীরের গায়ে অজান্তেই তাঁর পা ঠেকে যায়। স্বাভাবিকভাবেই তখন রামানন্দের মুখ থেকে 'রাম রাম' ধ্বনি উচ্চারিত হয়। কবীর সেইসময় উঠে দাঁড়ান এবং যথাবিহিত তাঁকে প্রণাম করেন। নিজের মনের কথা গুরু রামানন্দের কাছে খুলে বলেন। গুরুকে যে তিনি অবশেষে এইভাবে পেয়েছেন এবং তাঁর যে দীক্ষা হল, সেই কারণেই কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হন। গুরু রামানন্দও নাকি কবীরকে তখন শিষ্য হিশেবে স্বীকার করে নেন।
এই গল্প সত্য হোক বা না হোক, নিহিত ব্যঞ্জনাটুকু বোধহয় অস্বীকার করা যায় না। শেষ রাতের অন্ধকার থেকে আসন্ন অরুণোদয়ের মতোই, কবীরের জীবনে রামানন্দের সংস্পর্শে আত্ম-ধর্ম উদ্বোধনের তাৎপর্য বোধহয় এই কিংবদন্তীর মধ্যে রয়ে গেছে। যদিও ক্ষিতিমোহন সেনের বক্তব্য—"অন্ধকারে রামানন্দ তাঁর গায়ে পা দিয়া রাম রাম করিয়া উঠিলে কবীর সেই মন্ত্র গ্রহণ করিলেন, এসব বাজে কথা। কারণ, রামানন্দ আচার মানিয়া চলেন নাই বলিয়াই তাঁর নূতন পন্থের আরম্ভ। তাঁর বহু শিষ্যই সমাজবিধি অনুসারে বর্জনীয়।" ('ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা' পৃ ৬৫) কবীরের রামানন্দের কাছে দীক্ষাপ্রাপ্তির বিষয়ে এই ধরণের বিতর্ক ছাড়াও আরো যে প্রশ্নটি এক্ষেত্রে উত্থাপিত হয়, প্রধানত তা রামানন্দের জীবৎকালের সময় নিয়ে। পণ্ডিতদের ভেতর মতভেদই এর কারণ। উপেন্দ্রকুমার দাস লিখছেন— "মেকলিফ সাহেবের মতে গুরু রামানন্দ চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ এই সময়ের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন। ডঃ ভাণ্ডারকার অনুমান করেন ১২৯৯ কিংবা ১৩০০ খ্রিস্টাব্দে তার জন্ম হয় প্রয়াগে এক কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ পরিবারে। আবার কেউ কেউ অনুমান করেন রামানন্দের সময় ১৪০০ থেকে ১৪৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনেরও এই মত। তিনি এ সম্পর্কে রামানুজ দাস হরিবর-কৃত ভক্তিমাল-হরিভক্তি-প্রকাশিকার মত উদ্ধৃত করেছেন। তাতে আছে 'রামানন্দ রামানুজ থেকে পঞ্চম শিষ্য'। পঞ্চম শিষ্য অর্থ অধস্তন পঞ্চম পুরুষের শিষ্য। সেই হিসাবে রামানন্দের সময় ১৪০০ থেকে ১৪৭০ খ্রিস্টাব্দ এ অনুমান সমর্থিত হয়।" ('ভক্ত কবীর' পৃ ৪১-৪২)

যাই হোক-না-কেন, রামানন্দের উদার ধর্মবোধ কবীরকে প্রভাবিত করে থাকলে তিনি যে সেই রাম-রসায়ন পানে প্রেমের পথে তাঁর প্রিয়কে, তাঁর স্বামীকে অভিসারিকার মনে সন্ধান করেছিলেন সে বিষয়ে কোনো সংশয়ের অবকাশ নেই। ভক্তি-সাধনমার্গে রামানন্দের পরব্রহ্ম রামের নাম নিয়েই কবীর তাঁর চিরসখাকে আত্ম-ধর্মে দেখতে চাইলেন—তাঁর হৃদয়-নন্দন-বনের নিভৃত নিকেতনে সেই আনন্দমূল পুরুষোত্তমের বন্দনা গাইলেন প্রকৃতি-স্বরূপ কবীর। আর সেই শব্দ-গান, মধ্যযুগে উত্তর ভারতে যেসব সংস্কারমুক্ত ধর্মমত গড়ে উঠেছে, প্রত্যক্ষই

হোক আর পরোক্ষই হোক প্রতিটি ক্ষেত্রেই তার অনুরণন তুলল। তার প্রতিধ্বনি আয়তনবান হয়ে ডাক দিল পরবর্তী পথিকদের।

'প্রভু আমার, প্রিয় আমার'

হিন্দি সাহিত্যের হাজার বছরের ইতিহাসে কবীরের ব্যক্তিত্ব-মহিমার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী যদি কেউ থাকেন তবে অবশ্যই তিনি তুলসীদাস। কিন্তু কবীর এবং তুলসীদাস—এই দুই ব্যক্তিত্বের পার্থক্যও তো কম নয়। দুজনেই ভক্ত ছিলেন, কিন্তু দুজনের স্বভাব, সংস্কার এবং দৃষ্টিকোণ একদম আলাদা। কবীরের বাণীতে সমস্ত কিছুর ভেতর থেকে তাঁর সর্বজয়ী ব্যক্তিত্বই প্রধান হয়ে ওঠে। অনন্য সাধারণ জীবনরসে সম্পৃক্ত তাঁর বাণী। কবীরের বাণী অননুকরণীয়। অনুকরণের সব চেষ্টাই ব্যর্থ প্রতিপন্ন হয়েছে। এই ব্যক্তিত্বের কারণেই কবীরের উক্তিসমূহ শ্রোতাকে অনিবার্যভাবেই আকর্ষণ করে। ব্যক্তিত্বের এই অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণের জন্যই সহৃদয় সমালোচক কবীরকে 'কবি' মনে করে সন্তুষ্ট হন। এরকম আকর্ষণীয় বক্তাকে 'কবি' ছাড়া আর কী বা বলা যেতে পারে? অথচ কবীর তো কবিতা লেখার প্রতিজ্ঞা করে নিজের কথা বলেন নি। তাঁর ছন্দোযোজনা, উক্তি-বৈচিত্র্য এবং অলঙ্কার-বিধান সম্পূর্ণভাবেই স্বাভাবিক ও অযত্নসাধিত। কাব্যগত উপস্থাপনার দিক থেকেও তা যে খুব দুরন্ত তা নয়। তবু তাঁর অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্বের গুণেই সহৃদয় ব্যক্তিকে তা আকৃষ্ট করে। তাঁর আরো এক বড় গুণ এই যে অন্যান্য সন্তদেরও তিনি বিশিষ্ট করে তুলেছেন।

হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী যখন একথা জানান, আমাদের কাছে তখন ধর্মগুরু কবীরদাসের আধ্যাত্মিক পদসমূহের রসাস্বাদনে ব্যক্তিভেদে উপযোগের প্রশ্নটিও হাজির হয়। কবীরের পদসমূহ কাব্য হিশেবে আস্বাদনের চল যেমন একদিকে রয়েছে, তেমনি তাঁকে সমাজ-সংস্কারক, কী সর্বধর্মসমন্বয়কারী রূপে, হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য-বিধায়ক হিশেবে, কী সম্প্রদায় বিশেষের ধর্মগুরু হিশেবে বেদান্ত-ব্যাখ্যাতা দার্শনিকরূপে দেখার প্রচলনও পাশাপাশি রয়েছে। কিন্তু এর কোনো একটি মাত্রকে অবলম্বন করে তারই একমাত্র প্রতিনিধি হিশেবে কবীরকে ভেবে নিলে যথেষ্ট মুশকিল আছে। আর তা অসংগতও হবে।

কবীরের পদসমূহে এমন অনেক কিছুই পাওয়া যায়, সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে তা সহায়ক হলেও, তাঁকে সমাজ-সংস্কারক হিশেবে মেনে নেওয়া ঠিক হবে না অনেকটা এই কারণেই যে তাঁর মনের স্বাভাবিক ধর্ম যতখানি ব্যষ্টিমুখী ছিল, ততখানি সমষ্টি-বৃত্তিমুখী নয়। সর্বধর্মসমন্বয়ের ক্ষেত্রেও, তাঁর বিভিন্ন বক্তব্যে প্রয়োজনীয় অনেক উপাদান থাকা সত্ত্বেও তার সারকথা কিন্তু ভগবানের প্রতি একান্ত প্রেম এবং প্রত্যেক মানুষের ভেতর ঈশ্বরকে নির্বিশিষ্ট রূপে উপলব্ধি করা। অথচ একালে সর্বধর্মসমন্বয়ের যে অর্থ করা হয় তা কিন্তু কবীরের মনোভাবের অনুমোদন পায় না। সমস্ত ধর্মের বাহ্যাচার এবং অন্তর্গত সংস্কারের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট রূপটিকে লক্ষ করা এবং সমূহ আচার ও সংস্কারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনই এখনকার দৃষ্টিভঙ্গিতে সর্বধর্মসমন্বয়ের ভাবাত্মক রূপ। কবীর কিন্তু এর প্রবল বিরোধী ছিলেন। বাহ্যাচার এবং সংস্কারের বিচারবিহীন আনুগত্য তাঁর কাছে একেবারেই পরিত্যাজ্য ছিল। ধর্মবিশেষের প্রতি সহনশীলতা এবং সম্ভ্রমের মনোভাব নয়, বরং মুক্ত মনুষ্যত্বকেই তিনি এক্ষেত্রে প্রেমভক্তির পাত্র হিশেবে বিবেচনা করেছেন। তাছাড়াও প্রত্যেক মানুষকে সমান মর্যাদাজ্ঞানে তার জাতিগত, বংশগত, আচারগত বিচারের ঊর্ধ্বে তথা এসবের উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ ব্যতিরেকে গ্রহণ করাই ছিল তাঁর কাম্য। এসবের কোনো মূল্য তাঁর কাছে ছিল না। এমনকী সম্প্রদায়-প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে, তিনি ছিলেন বিরোধী মনোভাবের মানুষ। অথচ বিরোধ এখানেই যে, তাঁকেই সম্প্রদায়বিশেষের তথা

কবীরপন্থের প্রবর্তক জ্ঞান করে বহু লোক গৌরব বোধ করেন।
আসলে কবীর ধর্মীয় দ্বন্দ্বকে যে জায়গা থেকে দেখতেন, আজকের দিনে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যবিধানে ব্রতী মানুষজনের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে তার মিলের চেয়ে অমিলটাই বেশি। ভগবদ্বিশ্বাসকেই তিনি প্রধান বলে মনে করেছেন। দুই ধর্মের দু-পক্ষের দ্বন্দ্বে রোগলক্ষণ দেখে অপথ্য-রূপ বাহ্যাচার বর্জন করে ভগবদ্বিশ্বাসের ওষুধকেই নিদান হিশেবে তিনি বেছে নিয়েছেন। দুটি ধর্ম-সম্প্রদায়েরই মানুষজন যদি ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে এবং প্রকৃতই তারা ধার্মিক হয়, তাহলে এই ওষুধের অমোঘ প্রভাবকে তারা কোনোভাবেই এড়িয়ে যেতে পারবে না। বাহ্য আচারকেই ধর্ম বলে মনে করা এবং অকারণ উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ ও বংশমর্যাদার অভিমান, এই সবই অপথ্য রোগীর ক্ষেত্রে। বাহ্যাচারবর্জনের প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়েই নয় শুধু, ভগবদ্বিশ্বাসকে অবিভাজ্য শক্তি মনে করাই ছিল কবীরের দৃষ্টিভঙ্গি। এই দিক থেকেই তাঁকে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য-বিধায়ক বলা যায়।

তিনি ছিলেন মূলত ভক্ত। তাঁর ভক্তরূপই প্রকৃত রূপ। ভগবানে ভক্তি বা ঈশ্বরের প্রতি একান্ত প্রেমের ক্ষেত্রে তিনি এমন অনেক কথাই বলেছেন যা ভক্তি না হলেও ভক্তি উপলব্ধির ক্ষেত্রে সহায়ক। স্মরণীয় এই যে, তাঁর ভাষার মাধ্যমে যখন তা প্রকাশিত হয় তখন সেই গূঢ় অনুভবের আভাসই দেন মাত্র, মূলবস্তু যেহেতু একান্তভাবেই উপলব্ধির বিষয় তাই তার সংকেতই ভাষা ধরে রাখতে পারে। ভক্তি তো কাউকে বলে বোঝানো যায় না। সম্পূর্ণই তা অনুভবের বিষয়। প্রেম-ভক্তিই যেহেতু তাঁর বাণীর কেন্দ্রীয় বিষয়, তাই কবীরকে তাঁর পদসমূহে এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখলেই সংগত হবে। তিনি যখন বলেন—

> গুরু মোহি ঘুটিয়া অজর পিয়াঈ।
> জবসে গুরু মোহি ঘুটিয়া পিয়াঈ ভঈ সুচিত মেটী দুচিতাঈ।
> নাম-ঔষধী অধর কটোরী, পিয়ত অঘায় কুমতি গঈ মোরী।
> ব্রহ্মা-বিষ্ণু পিয়ে নহি পায়ে খোজত সম্ভু জনম গঁবায়ে।
> সুরত নিরত করি পিয়ে জো কোঈ কহৈ কবীর অমর হোয় সোঈ।
>
> (দ্র ৮০ সংখ্যক অনূদিত পদ)

'নাম-ঔষধী' শব্দটি তখন লক্ষ্যণীয় হয়ে ওঠে। নাম-মাহাত্ম্য উপলব্ধি করেই তাঁর প্রেম-ভক্তি-পথে অভিসার। আর সেই নাম-মাহাত্ম্য উপলব্ধিতে সহায়ক গুরু। নামৌষধি পান করেই তাঁর কুমতি তৃপ্ত হয়ে অপসারিত হয়েছে। বহির্মুখী প্রবৃত্তিকে সংযত করে তথা নিবৃত্তির মাধ্যমে অন্তর্মুখী প্রবৃত্তির অবলম্বনেই জীব আর ব্রহ্মের অভেদ-প্রতীতি সম্ভব হয়ে উঠেছে। এই সূত্রেই আমাদের কাছে স্মরণীয় হয়ে ওঠে—

> বেদ-কিতেব পঢ়ে বে কুতুবা বে মোল্লনা বে পাঁড়ে।
> বেগরি বেগরি নাম ধরায়ে এক মাটিয়াকে ভাঁড়ে।।
>
> (দ্র ৫৯ সংখ্যক অনূদিত পদ)

একই মাটিতে তৈরি ভাঁড় অথচ ভিন্ন ভিন্ন নামে তাকে সম্বোধন। বেদ পড়ে কেউ পাঁড়ে আর কোরান পড়ে কেউ মৌলানা। এরা একেকজন একেকনামে অভিহিত এবং তাদের ঈশ্বরও বিভিন্ন নামে সম্বোধিত হন। কিন্তু এরকম হবে কেন? কবীরের প্রশ্ন এই। তাই তিনি বলছেন—

> কঁহহি কবীর বে দূনৌ ভূলে রামহি কিনহু ন পায়া।
> বে খসসী বে গায় কটাবে বাদহি জন্ম গঁবায়া।

অর্থাৎ এরা কেউই রামকে পায় নি। এ যদি খাসি কাটে তো ও কাটে গরু। এদের জীবন বৃথাই

গেল।

এই রাম-নামই কবীরের কাছে সেই ঔষধি। তাঁর প্রভুর কাছে, প্রিয়র কাছে একান্ত অনুরাগে আত্ম-সমর্পণের উপায় এই নাম।

এই প্রসঙ্গেই স্মরণীয় রবীন্দ্রনাথের গানে সেই বাণী—

তোমারি নাম বলব নানা ছলে।
বলব একা বসে, আপন
মনের ছায়াতলে।
বলব বিনা ভাষায়,
বলব বিনা আশায়,
বলব মুখের হাসি দিয়ে,
বলব চোখের জলে।

বিনা-প্রয়োজনের ডাকে
ডাকব তোমার নাম,
সেই ডাকে মোর শুধু শুধুই
পুরবে মনস্কাম।
শিশু যেমন মাকে
নামের নেশায় ডাকে,
বলতে পারে এই সুখেতেই
মায়ের নাম সে বলে।

(গীতিমালা: ৩২)

কিন্তু একথা প্রেমের সেই অবস্থায়, যখন নামৌষধি পান করে কুমতি অপসৃত হয়েছে। যখন,

লালী মেরে লালকী জিত দেখোঁ তিত লাল।
লালী দেখন মৈঁ গঈ মৈঁ ভী হো গঈ লাল।।
জিন পাবন ভুঁই বহু ফিরে ঘুমে দেস বিদেস।
পিয়া মিলন জব হোইয়া আঙ্গন ভয়া বিদেস।।

(দ্র ১৯ সংখ্যক অনূদিত পদ)

মনে রাখতে হবে, কোনো 'বকুল বিছানো পথে' এই প্রেম নয়। ভক্তি ছাড়া ভগবানকে পাওয়া যায় না যেমন এবং ভক্তিপথে দিশারী যেমন গুরু, তেমনি অন্তরের অনুরাগ সত্ত্বেও 'কাম ঔর ক্রোধ মদ লোভসে জুঝনা মচা ঘমসান তন-খেত মাঁহী' অর্থাৎ কাম ক্রোধ মদ আর লোভের সঙ্গে লড়াই করতে হবে, দেহক্ষেত্রে যে প্রচণ্ড সংগ্রাম শুরু হয়েছে তার সঙ্গে যুঝতে হবে। আর এই লড়াইয়ে 'সীল ঔর সাঁচ সন্তোষ সাহী ভয়ে নাম সমসের তহাঁ খুব বাজে' অর্থাৎ শীল সত্য আর সন্তোষকে সাথী করে নামরূপ তলোয়ার দিয়ে লড়তে হবে। তাই এখানে অশ্রু, ক্লান্তি, মনোভয়ের কোনো স্থান নেই। এই সূত্রেই স্মরণীয় হয়ে ওঠে—

গগন দমামা বাজিয়া পড়ত নিসানে ঘাব।
খেত পুকারৈ সুরমা অব লড়নেকা দাব।।
জা মরণসে জগ ডরৈ সো মেরে আনন্দ।
কব মরিহৌঁ কব দেখিহৌঁ পূরণ পরমানন্দ।।

(দ্র ১৮ সংখ্যক অনূদিত পদ)

এই কথাই কি রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আমরা পেয়ে যাই না অন্যরকমভাবে?—

এ তো মালা নয় গো, এ যে
তোমার তরবারি।

জ্বলে ওঠে আগুন যেন,
বজ্র-হেন ভারী—
এ যে তোমার তরবারি।
তরুণ আলো জানলা বেয়ে
পড়ল তোমার শয়ন ছেয়ে,
ভোরের পাখি শুধায় গেয়ে
'কী পেলি তুই নারী'।
নয় এ মালা, নয় এ থালা,
গন্ধজলের ঝারি,
এ যে ভীষণ তরবারি। ('দান'/খেয়া)

কিন্তু এই কঠিন প্রেমেও তো শুনতে পান—

বক্ষে তোমার বাজে বাঁশি,
সে কি সহজ গান
সেই সুরেতে জাগব আমি
দাও মোরে সেই প্রাণ। (গীতাঞ্জলি: ৭৪)

রবীন্দ্রনাথ যখন লেখেন—

আমার এ প্রেম নয় তো ভীরু,
নয় তো হীনবল,
শুধু কি এ ব্যাকুল হয়ে
ফেলবে অশ্রুজল।
মন্দমধুর সুখে শোভায়
প্রেমকে কেন ঘুমে ডোবায়।
তোমার সাথে জাগতে সে চায়
আনন্দে পাগল।

নাচ' যখন ভীষণ সাজে
তীব্র তালের আঘাত বাজে,
পালায় ত্রাসে পালায় লাজে
সন্দেহ-বিহ্বল।
সেই প্রচণ্ড মনোহরে—
প্রেম যেন মোর বরণ করে,
ক্ষুদ্র আশার স্বর্গ তাহার
দিক সে রসাতল। (গীতাঞ্জলি: ৮৯)

তখন স্বাভাবিকভাবেই মনে হয় কবীরের প্রেমের সাধনার সঙ্গে এর তো কোনো বিরোধ নেই। আত্মজ্ঞানী সাধকপুরুষ কবীর যা বলতে চেয়েছেন কবি রবীন্দ্রনাথ তো সেই কথাই আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে লিখেছেন। এই সূত্রেই স্মরণীয় হয়ে ওঠে ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ যখন লেখেন—

"একথা মানতে হবে যে রাষ্ট্রিক সাধনা ভারতের সাধনা নয়। একদা বড় বড় রাজা ও সম্রাট আমাদের দেশে দেখা দিয়েছেন, কিন্তু তাঁদের মহিমা তাঁদের মধ্যেই স্বতন্ত্র। দেশের সর্বসাধারণ সেই মহিমাকে সৃষ্টি বহন বা ভোগ করে না। ব্যক্তিবিশেষের শক্তির মধ্যেই তার উদ্ভব এবং বিলয়।

কিন্তু ভারতের একটি স্বকীয় সাধনা আছে; সেইটি তার অন্তরের জিনিশ। সকল প্রকার

রাষ্ট্রিক দশা-বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে তার ধারা প্রবাহিত হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই ধারা শাস্ত্রীয় সম্মতির তটবন্ধনের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়, এর মধ্যে পাণ্ডিত্যের প্রভাব যদি থাকে তো সে অতি অল্প। বস্তুত এই সাধনা অনেকটা পরিমাণে অশাস্ত্রীয়, এবং সমাজশাসনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। এর উৎস জনসাধারণের অন্তরতম হৃদয়ের মধ্যে; তা সহজে উৎসারিত হয়েছে, বিধিনিষেধের পাথরের বাধা ভেদ ক'রে। যাঁদের চিত্তক্ষেত্রে এই প্রস্রবণের প্রকাশ, তাঁরা প্রায় সকলেই সামান্য শ্রেণীর লোক, তাঁরা যা পেয়েছেন ও প্রকাশ করেছেন তা 'ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন'।" ('ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা)

ভারতের সেই 'স্বকীয় সাধনা', তার অন্তরের জিনিশটিকে রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছেন বলেই তাঁর মর্মপ্রকৃতির সংগঠনে সেই উত্তরাধিকার আত্মীকৃত হয়ে যায়—তাঁর কবিতার ভেতরেও তাই নৈরাজ্য ও বিষাদের পরিব্যাপ্ত অন্ধকার থেকে ভিন্নতর নিষ্ক্রমণ সম্ভব হয়ে ওঠে একদিকে যেমন ভাববস্তুর ভিন্নতায়, তেমনি আরেকদিকে তাঁর ভাষাতেও। তার সাক্ষী নিশ্চয় একদিক থেকে নৈবেদ্য, উৎসর্গ, খেয়া, গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালির বিভিন্ন লেখায় ছড়ানো রয়েছে।

অচলায়তনের বিরুদ্ধে সাধকের সংগ্রাম যুগে যুগে ভারতবর্ষের সাধকদের ঘর আর বাইরের ঝঞ্ঝাকে অতিক্রম করে সমন্বয়ের বাণীকে যেভাবে মানবধর্মের অঙ্গাঙ্গী করে তুলেছে, তা যে প্রকৃতপক্ষে বলিষ্ঠ এক চলচ্ছক্তিরই প্রকাশ, এই সত্য তিনি উপলব্ধি করেছিলেন বলেই তাঁকে স্মরণ করতে হয়েছিল সেই সব মানুষকে, যাঁদের বাণীতে ঈশ্বরানুরাগ এবং কবিতা, দুটি পৃথক অবস্থায় ছিল না। কবীর, দাদূ তাঁদের অন্যতম। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন কবিতায়, গানে এঁদের প্রভাব বিচিত্র। একথা অন্তত বলতে পারা যায়, তিনি সেই আহরণকে নিজের মনের রসায়নে জারিত করেই যে শুধু পরিবেশন করেছিলেন তা নয়, যে উৎস থেকে তাঁর রসসঞ্চয় বৃদ্ধি পেয়েছিল, তাকেও তিনি আরো পাঁচজনের কাছে পরিচয় করিয়ে দিতে কার্পণ্য করেন নি। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে নিউইয়র্কে ম্যাকমিলান অ্যাণ্ড কোং থেকে প্রকাশিত 'ওয়ান হানড্রেড পোয়েমস্ অফ কবীর' তাঁর এরকমই একটি কর্ম। কবীরবাণী রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি ভাষান্তরে প্রকাশিত হবার পর পাশ্চাত্য জগৎ তার আরো কয়েকটি ভাষায় অনুবাদ করে কবীরবাণীর সুষমা-সম্ভোগে তৎপর হয়।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন : "য়ুরোপ আধুনিক ভারতের চিন্তধারার সন্ধান পাইল রবীন্দ্রনাথের কাব্য হইতে; প্রাচীন ভারতের ধর্মের কথা শুনিল তাঁহার 'সাধনা'র বক্তৃতা হইতে; এবং উভয়কে যোগযুক্ত করিয়াছে যে মধ্যযুগীয় সন্তরা তাহাদের কথা প্রকাশ হইল *One hundred Poems of Kabir* হইতে। অর্থাৎ ভারতের অতীত মধ্য ও আধুনিক জগতের মনের কথা রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করিলেন (১৯১৫) এইভাবে। ভারতের অখণ্ড সাধনার ধারা তাঁহার দ্বারা এইভাবে প্রচারিত হইল।" (রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক'। ২য় খণ্ড, পরিবর্ধিত ৩য় সং। পৃ ৩৫৬)

রবীন্দ্রনাথের কবীরবাণীর এই ইংরেজি ভাষান্তরে অবলম্বন ছিল ক্ষিতিমোহন সেন-সংকলিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ। রবীন্দ্র-জীবনীকার জানাচ্ছেন: "কিছুকাল পূর্বে শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন কবীর সাহেবের দোহা সঞ্চয়ন ও সম্পাদন করিয়া বাংলায় অনুবাদ করেন। সেই গ্রন্থ অবলম্বনে অজিতকুমার চক্রবর্তী শতাধিক সর্বোৎকৃষ্ট দোহা ইংরেজিতে অনুবাদ করেন ও কবীরের ধর্মসাধনা সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়া মিস্টিসিজম সম্বন্ধে ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ লেখিকা শ্রীমতী এভেলিন আনডারহিলের নিকট পাঠাইয়া দেন। রবীন্দ্রনাথ সেই অনুবাদগুলি

বাছিয়া ও প্রয়োজনমত অদলবদল করিয়া প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করেন; এই গ্রন্থের ভূমিকা লেখেন শ্রীমতী আন্‌ডারহিল। তিনি ভূমিকায় অজিতকুমারের রচনার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ এক পত্রে অজিতকুমারকে লিখিয়াছেন, 'রোটেনস্টাইন বলেন আমার তর্জমার নীচেই তোমার তর্জমা তাঁর সবচেয়ে ভাল লাগে। ইংরেজি তর্জমায় তোমাকে ছাড়াবার অভিপ্রায় আমার কোনো দিন ছিল না—এবং ছাড়িয়েছি বলে কোনো দিন কল্পনাও করিনি—গ্রহের চক্রান্তে গোলমালে কোনো দিন কেমন করে ঘটে গেছে তা জানিনে—অতএব এতে আমার কোনো দোষ নেই।" (১৯১২ সেপ্টেম্বর?)

ক্ষিতিমোহন সেন তাঁর সংকলিত ও সম্পাদিত 'কবীর' গ্রন্থটি সম্পর্কে 'ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা'-র 'নিবেদন' অংশে জানিয়েছেন: "কবীরের মুখ্য বাণীর মাত্র চারিটি খণ্ড প্রকাশ হইয়াছিল। এইরকম দশটি খণ্ড বাহির হইলে কবীরের কতকটা পরিচয় দেওয়া যাইত। মধ্যযুগের এমন প্রায় দুই শত জন সাধকের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে যাঁদের বাণী মানবসাধনার পথে নানাভাবে সহায়তা করিবে।"

স্বভাবতই আমাদের আগ্রহ জাগে 'গীতাঞ্জলি'-র অনুবাদকের হাতে কবীরের অনুবাদ কীরকম হয়েছিল; সেই অনুবাদ পড়ে কে কীরকম প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথকৃত কবীরের অনুবাদ অনেককেই অনুপ্রাণিত করেছিল। একটি দৃষ্টান্ত দিই। উইল ডুরান্ট 'দি স্টোরি অফ সিভিলাইজেশন' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড 'আওয়ার ওরিয়েন্টাল হেরিটেজ'-এ কবির কবীর-অনুবাদ থেকে কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত করেছিলেন, 'দি লিটারেচার অব ইন্ডিয়া' নামক একটি উপ-অধ্যায়ে।

> There is an endless World. O my brother,
> And there is a nameless Being, of whom naught can be said;
> Only he knows who has reached that region.
> It is other than all that is heard or said.
> No form, no body, no length, no breadth is seen there;
> How Can I tell you that which it is?
> Kabir says: "It cannot be told by the words of the
> mouth, it cannot be written on paper;
> It is like a dumb person who tastes a sweet
> thing—how shall it be explained?

এই অনুবাদ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রজীবনীকার জানাচ্ছেন: "রবীন্দ্রনাথ-কৃত কবীরের ইংরেজি অনুবাদ যথাসময়ে অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় য়ুরোপীয় ভাষাসমূহে অনূদিত হয়। সকল দেশই প্রসন্নচিত্তে এই অনুবাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এ দেশে যাঁহারা কবীর সম্বন্ধে বিশেষভাবে ওয়াকিবহাল তাঁহারা এই অনুবাদ পড়িয়া সুখী হইতে পারেন নাই। তাঁহাদের মতে কবীর হইতে কবির ভাবই ব্যক্ত হইয়াছে বেশি করিয়া; মূল কবীরকে কবির অনুবাদ হইতে পাওয়া যায় না।"

কিন্তু একথা অন্তত আমাদের পক্ষে বুঝে-ওঠা অসম্ভব নয়, কবীরের প্রেমের সাধনায় অনেক বাণীর সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের কবিতার, গানের অনেক ভাবেরই সাযুজ্য নেহাত কম নেই। এমন নয় যে সেসব ক্ষেত্রে একমাত্র উৎস ছিলেন কবীরই। কেননা তেরো-চোদ্দ বছর বয়েস থেকেই তিনি বৈষ্ণব পদাবলি পাঠ করেছেন। আর 'ভানুসিংহ' যখন বৈষ্ণব পদামৃতে মত্ত ছিলেন তখনই তো তাঁর অন্তরে গভীরচারী হয়ে উঠেছিল সেই ভাব। তা যে আরো সুসংস্কৃত হয়ে ভিন্নতর

ভাষায় বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছে পরবর্তী সময়ে, তার কারণ তো কেবলই ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথের ভারতাত্মার অনুসন্ধানে মধ্যযুগের এইসব সাধকের বাণীর রসাস্বাদন নয়। সেখানে রয়েছেন বাংলার বাউলরা। রয়েছেন স্বয়ং লালন ফকির। যাঁর গানের খাতা 'রবিবাবু মশায়' সংগ্রহ করেছিলেন। (এ বিষয়ে দ্রষ্টব্য সুধীর চক্রবর্তী প্রণীত 'ব্রাত্য লোকায়ত লালন' গ্রন্থটি) রয়েছেন হাফেজও। যাঁর সম্পর্কে তিনি লিখেছিলেন, "আমার পিতা ছিলেন হাফেজের অনুরাগী ভক্ত। তাঁর মুখ থেকে হাফেজের কবিতার আবৃত্তি ও তার অনুবাদ অনেক শুনেছি। সেই কবিতার মাধুর্য দিয়ে পারস্যের হৃদয় আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করেছিল।" তাঁর মর্মপ্রকৃতির সংগঠনে শৈশব থেকে শোনা উপনিষদের বাণীই তো কেবল সক্রিয় ছিল না। বহুস্তরে ব্যাপ্ত তাঁর অনুশীলন ধর্মতত্ত্বের গভীর সব ভাবকে তাঁর অন্তর্মুখী কবি স্বভাবে সম্পৃক্ত করে নিজেকে রচনা করেছে।

কবীরের বাণীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিন্তার সামীপ্য ক্ষিতিমোহন সেন লক্ষ করেই একসময় লেখেন— "গীতাঞ্জলির মধ্যে মধ্যযুগের বাণীর কিছু ভারসাম্য দেখিয়া আমিই কবীরের বাণীর বিষয় তাঁহাকে প্রথম জানাই। তাতেই আমি কবির কাছে ধরা পড়ি। তাহা ঘটে ১৯১০ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে। তাহার কিছুকাল পরে আমার কবীরের প্রথম খণ্ড বাহির হয়। কবীর বাণী দেখিয়া তিনি গীতাঞ্জলি লেখেন নাই। গীতাঞ্জলি দেখিয়া তাঁহাকে আমি কবীর বাণী দেখাই।" (রবীন্দ্র জয়ন্তী: মাসিক বসুমতী, বৈশাখ ১৩৫৩)

'খেয়া' থেকে গীতালি' পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে আবু সয়ীদ আইয়ুব "ভরা সরোবরের কবিতা" ('আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ') বলে অভিহিত করেছিলেন। এই পর্বেই রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'র সঙ্গে কবীরের দোহার সম্পর্ক নিয়ে কিছু প্রশ্নও উত্থাপিত হয়। সেই সূত্রেই আমাদের তাকাতে হয়ে সাম্প্রতিককালের রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রশান্তকুমার পালের বক্তব্যের দিকেও। প্রশান্তকুমার পাল জানাচ্ছেন— "মধ্যযুগীয় সন্তবাণী, বিশেষত কবীরের দোঁহাবলীর সঙ্গে গীতাঞ্জলির সম্পর্ক বিষয়ে বিতর্কটির প্রসঙ্গও আলোচনা করে নেওয়া থেকে যেতে পারে। আমরা আগেই বলেছি, গীতাঞ্জলির মূল পাণ্ডুলিপিতে কবীর, তুলসীদাস প্রমুখ সন্ত কবিদের আঠারোটি দোহা লিখিত আছে। যার সঙ্গে আমরা একমত নই। কিন্তু চাঁদকবি, তুলসীদাস প্রভৃতি কবির মূল রচনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ছিল, তাছাড়া কবীরের জীবন ও রচনার সঙ্গেও যে তাঁর পরিচয় ছিল তার প্রমাণ দুর্লভ নয়। ওই পরিচয় আরো গভীর হয় ক্ষিতিমোহন সেনের সান্নিধ্যে এসে।" ('রবিজীবনী', খণ্ড ৬, পৃ ১৬২-১৬৩)
ক্ষিতিমোহন সেনের বক্তব্যের ক্ষেত্রে প্রশান্তবাবু এও জানাচ্ছেন— "তথ্যের দিক দিয়ে তা কিছুটা ভ্রমাত্মক।" এমনকী নাগরী প্রচারিণী সভা-সম্পাদিত কবীর গ্রন্থাবলির উপক্রমণিকায় যে বলা হয়েছে— 'বাংলার কবীন্দ্র রবীন্দ্রকেও কবীরের ঋণ স্বীকার করিতে হইবে। রহস্যবাদের (mysticism) বীজ তিনি কবীরের কাছেই পাইয়াছেন। শুধু তাহাতে জমকালো পাশ্চাত্য পালিশটি দেওয়া হইয়াছে। ভারতীয় রহস্যবাদকে ইনি পাশ্চাত্য ঢঙে সাজাইয়াছেন ইহাতেই তো য়ুরোপে তাঁর এত প্রতিষ্ঠা।" একথাও যে "অতিরেক-দুষ্ট এবং তা কেন, সে ব্যাপারে প্রশান্তবাবু প্রাঞ্জলভাবেই তাঁর বক্তব্য উপস্থিত করেছেন। যার সঙ্গে আমাদের দ্বিমত হওয়ার অবকাশ কম। শুধু তাই নয়, রবীন্দ্র-মানসের গঠনে ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে ব্যক্তিগত নানা চর্চা ব্যতিরেকেও যে কর্মী রবীন্দ্রনাথ 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা সম্পাদনার কালে কীভাবে বিভিন্ন লেখককে দিয়ে বিচিত্র বিষয়ে লিখিয়ে নিয়েছিলেন, উৎসাহিত করেছিলেন বিভিন্ন জনকে তার প্রমাণও প্রশান্তবাবু দাখিল

করেছেন। এই সমস্ত কিছুর নিরিখে তো বটেই, রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবনে "আত্মীয় বিয়োগ ব্যথায় ক্রমশ অন্তর্মুখী হয়ে আত্মসাক্ষাৎকারের সাধনায়" যে তিনি নিবিষ্ট হয়েছিলেন এবং তারই প্রকাশ একদিকে যেমন শান্তিনিকেতন বক্তৃতামালায়, তেমনি অন্যদিকে গীতাঞ্জলি পর্বের পটভূমিও যে নির্মাণ করেছিল, একথা আমাদের পক্ষে অবশ্য-স্মরণীয়।

যাইহোক, কবীরের বিভিন্ন পদসমূহে আমরা প্রেমের যে ভাবরূপ পাই—প্রিয়-বিরহে বিরহিণীর যে মনোভাব সেখানে প্রকাশিত, তা নিশ্চয় ভগবানের প্রতি ভক্তের অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ। উপেন্দ্রকুমার দাস এই প্রসঙ্গেই যখন মন্তব্য করেন—"কবীরের প্রেমকে মুখ্যত গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের স্বকীয়া প্রেম বলা যায়। তার প্রিয় শুধু প্রণয়ী মাত্র নন, তিনি বর, তিনি স্বামী। কিন্তু প্রিয়-বিরহে কবীরের যে দুঃসহ ব্যাকুলতা যে-প্রবল আবেগ প্রকাশ পেয়েছে, একমাত্র বৈষ্ণবদের পরকীয়া প্রেমের ব্যাকুলতা ও আবেগের সঙ্গেই তার তুলনা হতে পারে।" তখন আমরা একমত হয়েও কিন্তু অন্যত্র দৃষ্টিপাত করতে চাই।

লক্ষণীয় বিষয় এই যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় আধ্যাত্মিক রসে আপ্লুত হওয়া সত্ত্বেও তৎকালীন জনজীবনের গভীরে এর শিকড় এতটাই দৃঢ়ভাবে প্রোথিত—প্রাকৃত জীবনের ছায়া সেখানে এতই প্রগাঢ় যে তাঁর প্রেমের বাণীতে ভক্ত আর ভগবানের সম্পর্ক ছাড়াও সাধারণ রমণী-জীবনের বাস্তব অবস্থার প্রতিফলনও অপ্রতিরোধ্যভাবেই ঘটে গেছে। তাঁর বিভিন্ন পদে সেকালে মেয়েদের বাল্য-বিবাহ এবং বয়োবৃদ্ধি না হওয়া অবধি বাপের বাড়িতে থাকা, তারপর নির্দিষ্ট সময়ে মেয়েদের শ্বশুড়বাড়ি পাঠানো এবং সেখানে গিয়েও নবাগতা বধূর শাশুড়ী-ননদ-জা-পরিবৃত জীবনে সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকা, স্বামীকে একান্তে না পাওয়ার বেদনা, যদিবা পাওয়া যায় তো স্বামীর পছন্দ-অপছন্দের ওপর নির্ভরশীল থেকে তার মনমতো নিজেকে সবসময় প্রস্তুত রাখা—এই সমস্ত কিছুই একাধারে সেকালের লোকজীবনের অঙ্গাঙ্গী হয়ে প্রকাশিত। তত্ত্বগত দিক থেকে আলোচনা করলে আমরা হয়তো অবশেষে দেখতে পাব ভাবের দিক থেকে বৈষ্ণব পদাবলি এবং কবীর-পদাবলির প্রেম দার্শনিক পটভূমিকায় সমীপবর্তী। কিন্তু জোলা কবীরের প্রাকৃত জীবনের স্পর্শে যে মর্মবাণী ধ্বনিত হয় তাঁর পদে, তার সম্পদ আলাদা নিশ্চয়ই। অনূদিত পদসমূহে ক্ষেত্রবিশেষে সহৃদয় পাঠক নিশ্চয়ই তা লক্ষ করবেন আশা করি। কবীর যে সমাজের মানুষ ছিলেন, সেই শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের লৌকিক জীবন তাঁর পদাবলিতে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই প্রতিফলিত। যেমন একদিকে তাঁতি—তার তাঁতঘর, সুতো সাফাই, কাপড় বোনা এই সব কিছু পেয়ে যাই। তেমনি আবার আরেকদিকে ধোপা—রংরেজ, তার ভাঁটিখানা এইসবও রয়েছে। আর এই শ্রমজীবী মানুষজনের বড় রকমের আশ্রয় যে ভাঁটিখানা, তাও এসবের পাশাপাশি পাওয়া যায়। লৌকিক জীবনের ওপর ভিত্তি করে কবীরের পদাবলিতে নিগূঢ় আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনাও তাই অন্য মাত্রা পায়। আধ্যাত্মিক রসে জারিত হয়েও তাঁর প্রেম-ভক্তির পরাকাষ্ঠামূলক পদসমূহ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের কাছে পরতে পরতে মেলে ধরে তাদের লোকজীবনের শেকড়ময় অস্তিত্ব—তাদের বাস্তবতা।

•

একদিকে আমরা যখন কবীরকে তাঁর পরমের কাছে আশ্রয় নিতে দেখি 'রাম'-নামে এবং আমরা জানি এই রাম কোনো অযোধ্যার রাজা দশরথের পুত্র নয়, এমনকী হরি, কেশব, গোবিন্দ, মাধব প্রভৃতি নামেও তাঁর পরমকে অভিহিত হতে দেখি—এই সমস্ত শব্দের পৌরাণিক অর্থে নয়, আবার অন্যদিকে যখন দেখতে পাই তিনি সাহেব, সাঁই, প্রিয়, ননদের ভাই বলে তাঁর অবিনাশী 'দুলহা'কে সম্বোধন করছেন, স্বভাবতই তখন আমাদের কাছে একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে যায়—ভগবান যিনি দ্বন্দ্বাতীত, দ্বৈতাদ্বৈতবিলক্ষণ, ত্রিগুণরহিত, কবীরের ব্যক্তিগত ঈশ্বর

তিনিই। নির্গুণ, অদ্বৈত ভগবানের সঙ্গে ভক্তের প্রেম যে সম্ভব হয়ে উঠতে পারে ব্যক্তিগত ঈশ্বরের ভেতর দিয়েই, এইসব বিচিত্র পদই আমাদের কাছে তা জানিয়ে দেয়। তাই কবীরের ভগবান একদিকে যেমন নৈরাত্মিক, তেমনি আরেকদিকে বৈয়ক্তিক বা ব্যক্তিগত হয়ে ওঠেন। এই সূত্রেই আমাদের কাছে 'সীমা-অসীম', 'রূপ-অরূপ'-এর প্রসঙ্গে কবীরের জবানি ঔৎসুক্য জাগায়।

কবীরের একটি পদে বলা হচ্ছে—

> অবিনাসী কী সেজ কা, কৈসা হৈ উনমান।
> কহিবে কী সোভা নহী, দেখে হী পরমান ॥
> অবিনাসী কী সেজ পর, কেরৈ আনন্দ।
> কহৈ কবীর বা সেজ পর, বিলসত পরমানন্দ ॥

অর্থাৎ কেউ কেউ প্রশ্ন করে অবিনাশী প্রিয়র শয্যা (শেজ) কী করে হবে? তা তো অনুমানমাত্র। তার শোভা বলে বোঝানো যাবে না, তা দেখেই জানতে হয়। ওহে বিরহিণী ওই অবিনাশী প্রিয়তমের শয্যায় গিয়ে কেলি করো। কবীর সাক্ষী হয়ে বলছে সেখানে পরমানন্দ বিলাস করছেন।

আবার আরেকটি পদে রয়েছে—

> হৈ কোই ঐসা পর-উপকারী, হরিসূঁ কহৈ সুনাই রে।
> ঐসে হাল কবীর ভয়ে হৈ, বিনু দেখে জিয় বাই রে ॥

অর্থাৎ, হায় এমন কোনো পরোপকারী কি নেই, যে ওই প্রিয়তমকে বলবে কবীর তোমার বিরহে কাতর? যতক্ষণ না ওই প্রিয়তমের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মিলছ ততক্ষণ মনস্তাপ কী করে দূর হবে?

ভক্তির একমাত্র শর্ত যে ঐকান্তিক বিশ্বাস এবং নিষ্ঠা, কবীরের এই বাণীতে তারই প্রকাশ। সন্দেহাতীতভাবেই কবীরের ভগবান সেই অনির্বচনীয়, পক্ষাতীত পুরুষোত্তম। দ্বিবেদীজী যাকে 'অপরংপার পুরুষোত্তম' বলেছেন। কোন ভক্তই বা ভগবানকে তা মনে না করে? এমন প্রশ্ন তুলেই তিনি বলছেন—"শাস্ত্র-জ্ঞানের যাঁরা দাবি করেন এবং কবীরের ভক্তি ও অদ্বৈত-ভাবনা ও নির্গুণ প্রেমকে পরস্পর-বিরোধী বলে যাঁরা মনে করেন, কোন উদ্দেশ্যে তা করেন, সেটি তাঁরাই জানেন। আমি তো সাহস করে দৃঢ়তার সঙ্গেই বলতে চাই, কবীরের ভক্তি এবং ভগবদ্ভাবনায় যুক্তি এবং শাস্ত্রের সঙ্গে কোনো বিরোধই নেই। যদি কোথাও বিরোধ দেখা যায় তবে তার ঐতিহাসিক কারণও আছে। তার সমাধান করাও খুব কঠিন নয়। কবীরদাস যোগ-মার্গের দিকে ঝুঁকেছিলেন। তাঁর বংশ এবং কুল-গুরু-পরম্পরা ওই মার্গেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। পরবর্তীকালে রামানন্দের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়। খুব অসম্ভব কিছু নয়, রামানন্দের দ্বারা প্রভাবান্বিত হবার আগে তিনি এমন বহু পদই রচনা করে থাকবেন, যাদের ভেতর যোগ-সম্প্রদায়ের পরম্পরা-সূত্রে প্রাপ্ত অকরুণ ভাবই পরিলক্ষিত হয় এবং তার ভেতর ভক্তিরসের লেশমাত্র নেই। ... যেদিন থেকে মহাগুরু রামানন্দ কবীরকে ভক্তি-রূপী রসায়ন দিলেন, সেই দিন থেকেই তিনি সহজ সমাধির দীক্ষা পেলেন, চোখ-কান বুজে সাধনা আর মুদ্রা, আসনের গোলামিতে সেলাম ঠুকলেন। তাঁর চলাই হল পরিক্রমা, কর্মই হল সেবা, শয়নই হয়ে উঠল প্রণাম, কথনই হয়ে উঠল নাম-জপ আর খাওয়াদাওয়াই পূজার স্থান নিল। হঠযোগের ক্রিয়াকলাপ দূর হয়ে খোলা চোখে তিনি তাঁর ভগবানের মধুর রূপ প্রত্যক্ষ করলেন, কান খোলা রেখে শুনলেন অনাহত নাদ, উঠতে-বসতে সবসময়ই সমাধির আনন্দ অনুভব করলেন এবং অনন্ত উল্লাসের আবেগে তিনি ঘোষণা করলেন—

সাধো, সহজ সমাধি ভলী।
গুরু-প্রতাপ যা দিন তৈ উপজী, দিন-দিন অধিক চলী।।
জই-জই ডোলৌ সোঈ পরিকরমা, জো কছু করো সো সেবা।-
জব সোবৌ তব করৌ দণ্ডবৎ, পূজৌ ঔর ন দেবা।।
কহৌ সো নাম সুনৌ সো সুমিরন, খাব-পিয়ৌ সো পূজা।
গিরহ-উজাড় এক-সম লেখৌ, ভাব ন রাখৌ দূজা।।
আঁখ ন মূঁদৌ কান ন রূঁধো, তনিক কষ্ট নহি ধারৌ।
খুলে নৈন পহিচানৌ হঁসি-হঁসি, সুন্দর রূপ নিহারৌ।।
সবদ-নিরন্তর সে মন লাগা, মলিন বাসনা ত্যাগী।
উঠন-বৈঠন কবহুঁ ন ছূটে, ঐসী তারী লাগী।।
কহ কবীর যহ উনমুনি-রহনী, সো পরগট করি গাঈ।
দুখ-সুখ সে কোঈ পরে পরমপদ, তেহি পদ রহৌ সমাঈ।।"

('কবীর' পৃ ১৩২—১৩৩)

প্রসঙ্গত উল্লেখ থাক, কবীরের এই পদটির ভিন্ন রূপও আছে। পাঠান্তর ক্ষেত্র-বিশেষে দেখা গেলেও মূলভাবের কোনো পার্থক্য নেই। দ্বিবেদীজীর উদ্ধৃত এই পদটির সঙ্গে ক্ষিতিমোহন সেন কর্তৃক সংকলিত কবীরের এই একই পদের পাঠভেদ মিলিয়ে দেখলে দ্বিতীয় চরণে পাওয়া যায়—'সাঁঈতে মিলন ভয়ো যা দিনতেঁ সুরত ন অন্ত চলী'। লক্ষণীয়, দ্বিবেদীজীর উদ্ধৃত পদটির দ্বিতীয় চরণে 'সাঁঈতে মিলন ভয়ো'…-র জায়গায় 'গুরু-প্রতাপ যা দিন তৈ উপজী'…রয়েছে। এছাড়া, চরণের অবস্থানগত তারতম্যও চোখে পড়ে। তবে মোট চরণ-সংখ্যা উভয়ক্ষেত্রেই বারো। দ্বিবেদীজীর গ্রন্থে, 'কবীর-বাণী' শীর্ষক সংকলনে দুশ পঞ্চান্নটি পদের প্রথম একশোটি ক্ষিতিমোহন সেনের সংকলন থেকে নেওয়া। বর্তমান গ্রন্থে ৯৬ সংখ্যক অনূদিত পদটি ওই একশোটি পদের ৪১ সংখ্যকের অনুসারী।

এই যে কবীর বলছেন—'আঁখ ন মূঁদৌ কান ন রূঁধো, তনিক কষ্ট নহি ধারৌ।/ খুলে নৈন পহিচানৌ হঁসি-হঁসি, সুন্দর রূপ নিহারৌ', তাঁর পরমের এই মধুর রূপ তিনি দেখলেন কী করে, যিনি অরূপ তাঁকে রূপের ভেতর কীভাবে পেলেন কবীর? তিনি বলছেন—

তোকো পীব মিলেঙ্গে ঘুঁঘটকে পট খোল রে।
ঘট ঘটমেঁ বহী সাঁঈ রমতা কটুক বচন মত বোলরে।।
ধন জোবন কো গরবন কীজৈ ঝূঠা পঞ্চরঙ্গ চোল রে।।
সুন্ন মহলমেঁ দিয়না বার লে আসাসোঁ মত ডোল রে।।
জোগ জুগত সো রঙ মহলমেঁ পিয়া পাঈ অনমোল রে।
কহৈ কবীর আনন্দ ভয়ো হৈ, বাজত অনহদ ঢোল রে।।

অর্থাৎ তোর সঙ্গে প্রিয়র মিলন হবে, ঘোমটার কাপড় সরিয়ে দে। ঘটে-ঘটে সেই স্বামীই রয়েছেন, কটুকথা বলিস না। ধন-যৌবনের গর্ব করিস না, পাঁচরঙা কাপড় (অর্থাৎ পঞ্চেন্দ্রিয়ময় শরীর) মিথ্যে। শূন্য মহলে প্রদীপ জ্বালিয়ে নে, আশার দোলায় দুলিস না। যোগ-সাধনায় সেই রঙমহলের অমূল্য সম্পদ প্রিয়কে পেয়েছি। কবীর বলছে তাই বড় আনন্দ হচ্ছে, অনাহত ঢোল বাজছে।

আবার আরেক জায়গায় তিনি বলছেন—

চন্দন ঘসি ঘসি অঙ্গ লগাউ।
রাম বিনা দারুণ দুখ পাউ।।
সত-সঙ্গতি মতি মন করি ধীরা।
সহজ জানি ভজৈ রাম কবীরা।।

অর্থাৎ চন্দন ঘসে ঘসে শরীরে লাগাই, (কেননা, 'জরৈ সরীর যহ তন কৌঈ ন বুঝাবৈ।/ অনহ দহৈ নিস নীঁদ ন আবৈ।।) রামের বিরহে আমি নিদারুণ দুঃখ পাচ্ছি। সৎসঙ্গে মতি আর মনকে স্থির করেই রামকে সহজ উপায়ে পাওয়া যায়, তাই কবীর তাঁরই ভজনা করছে।
মতি আর মনকে স্থির করে তবেই তিনি 'রাম'কে পেয়েছেন। কোথায় আছেন তাঁর রাম? কবীর বলছেন—

নৈনোঁ কী করি কোঠরী, পুতরী পলংগ বিছায়।
পলকোঁ কী চিক ডারিকৈ, পিয়া কো লিয়া রিঝায়।।
প্রীতম কো পতিয়া লিখুঁ, জো কহুঁ হোয় বিদেস।
তন মেঁ মন মেঁ নৈ মেঁ, তাকৌ কহা সন্দেস।।

(দ্র ৩১ সংখ্যক অনূদিত পদ)

শরীরে, মনে, নয়নে যিনি রয়েছেন সেই তাঁকে তো দেবস্থানের গণ্ডীতে খোঁজ করা বৃথা। অন্তরেই যিনি রয়েছেন, তাঁকে খামোখা বাইরে খোঁজ করার তো দরকার নেই। তাই মুরশিদকে উদ্দেশ করে কবীর বলছেন—'মুরসিদ নৈনোঁ বীচ নবী হৈ'। (দ্র ৬ সংখ্যক অনূদিত পদ) আর প্রিয়-অনুরাগিণী স্বগতোক্তি করে এই বলে—

নৈনা অন্তরি আব তূঁ জ্যা হৌ নৈন ঝাঁপেউ।
না হৌ দেখৌঁ ঔরকূ না তুঝ দেখন দেউ।।
কবীর রেখ সিন্দূর কী কাজল দিয়া ন জাই।
নৈনূঁ রমইয়া রমি রহ্যা দূজা কহা সমাই।।

(দ্র ২৯ সংখ্যক অনূদিত পদ)

এই কথা কি আমরা পেয়ে যাই না রবীন্দ্রনাথের গানে?—

আমার   প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে,
                 তাই হেরি তায় সকল খানে।।
আছে সে   নয়নতারায়   আলোক-ধারায়,   তাই না হারায়—
ওগো   তাই দেখি তায়   যেথায় সেথায়
                 তাকাই আমি যে দিক-পানে।।
আমি তার   মুখের কথা   শুনব ব'লে   গেলাম কোথা,
                 শোনা   হল না, হল না—
আজ   ফিরে এসে   নিজের দেশে   এই যে শুনি
শুনি   তাহার বাণী আপন গানে।।
কে তোরা   খুঁজিস তারে   কাঙাল বেশে   দ্বারে দ্বারে,
                 দেখা   মেলে না, মেলে না—
তোরা   আয়রে ধেয়ে,   দেখ রে চেয়ে   আমার বুকে—
ওরে   দেখরে আমার দুই নয়ানে।।

'দুই নয়ানে' যে অনুরাগিণী তার প্রিয়কে দেখতে পায়, সে যে চোখের আলোয় চোখের সীমাকেই অতিক্রম করে, সে যে তারের বীণা ছেড়ে হৃদয়-বীণার তন্ত্রীতে তার প্রিয়তমের সঙ্গে প্রাণের খেলা খেলে তাতে আর সন্দেহ কী। কবীর যখন জানান, চোখ-কান বুজে, মুদ্রা-আসন করে তাঁর সাধনার ভড়ং চলে গেল—সদগুরুর কৃপায় যখন তিনি তাঁর পরমের মধুর রূপ দেখতে শিখলেন, তখনই তো এই হৃদয়-বীণায় ধ্বনিত তাঁর পরমের সঙ্গে প্রাণের খেলা—তাঁর সহজ সমাধির মধ্যে পরমানন্দ। রবীন্দ্রনাথ এই কথাটাই তাঁর গানে বললেন একটু অন্যরকমভাবে—

তোমায় নিয়ে খেলেছিলেম খেলার ঘরেতে।
খেলার পুতুল ভেঙে গেছে প্রলয় ঝড়েতে।
থাক তবে সেই কেবল খেলা, হোক-না এখন প্রাণের মেলা—
তারের বীণা ভাঙল, হৃদয়-বীণায় গাহি রে।

প্রিয়তমের মধুর রূপ যখন অনুরাগিণী দেখল তখন সেই অনিঃশেষ মধুরিমায় তার সর্বাঙ্গ শিহরিত—সেই আবেশ তার প্রাণে-মনে। তাই রবীন্দ্রনাথের গানে যখন পেয়ে যাই এমন কথা—

মধুর, তোমার শেষ যে না পাই প্রহর হল শেষ—
ভুবন জুড়ে রইল লেগে আনন্দ-আবেশ।।
দিনান্তের এই এক কোণাতে সন্ধ্যামেঘের শেষ সোনাতে
মন যে আমার গুঞ্জরিছে কোথায় নিরুদ্দেশ।।
সায়ন্তনের ক্লান্ত ফুলের গন্ধ হাওয়ার 'পরে
অঙ্গবিহীন আলিঙ্গনে সকল অঙ্গ ভরে।
এই গোধূলির ধূসরিমায় শ্যামল ধরার সীমায় সীমায়
শুনি বনে বনান্তরে অসীম গানের রেশ।।

এর সঙ্গে কি কোথাও বিরোধ আছে কবীর যখন বলেন—'লালী মেরে লাল কী জিত দেখোঁ তিত লাল'? 'অঙ্গবিহীন আলিঙ্গনে সকল অঙ্গ ভরে'—এই কথাই তো কবীর বহুবার বলেছেন তাঁর পদাবলিতে। শ্যামল ধরার সীমায় সীমায় বনে বনান্তরে যে অসীম গানের রেশ শুনতে পান রবীন্দ্রনাথ, কবীর তো সেই অসীমকেই অভিসারিকার মধ্যে প্রকাশ করেন। যখন বলেন তিনি—

চুনরিয়া হমরী পিয়া নে সঁবারী,
কোঈ পহিরৈ পিয় কী প্যারী!
আঠ হাত কী বনী চুনরিয়া
পাঁচ রংগ পটিয়া পারী।
চাঁদ সুরুজ জামৈ আঁচল-লাগে
জগমগ জ্যোতি উজারী।
বিনু তানে যহ বনী চুনরিয়া
দাস কবীর বলিহারী।।

অবিভাজ্য, অগণনীয়, অপরিমেয় কালকে আমরা বিভক্ত করে গণনা করি পরিমাপ করি আমাদের সুবিধার্থে। সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-তারা-উপগ্রহের মাধ্যমে এবং মন বুদ্ধি প্রভৃতি অন্তঃকরণ দিয়ে আমরা অবিভাজ্য কালের স্বরূপ তথা রস উপলব্ধি করি। কাল-রূপ সনাতন তন্তে যে উত্তরীয় তৈরি হয়েছে পঞ্চতত্ত্বই তার উপযুক্ত রং। পঞ্চতত্ত্ব, অর্থাৎ জড় প্রকৃতি। এই মহান শৃঙ্গার-পটের আঁচলে সূর্য চন্দ্র তারার জ্যোতিই হল ত্রিগুণ-সামগ্রী। কিন্তু এই অনাদি-অনন্ত ওড়না টানা-পোড়েনে তৈরি নয়। এই ওড়না সনাতন, চিরনবীন। যে প্রণয়ী প্রসন্ন হয়ে তাঁর প্রণয়িনীকে এই শৃঙ্গার-বস্ত্র দান করেছেন, ধন্য তাঁর প্রিয়তমা, বলিহারী সেই প্রিয়তমের!

এই বিশাল পরিধেয় যে প্রিয় দান করেছেন সে তো অদ্ভুত, আপনায় তিনি আপনি মস্ত। তাঁর প্রেম তো সস্তা নয়, পলাকা নয়। যাকে তিনি এই চুনরি দিয়েছেন বড় মূল্যই তার জন্য আদায় করে ছাড়েন।এ জিনিশ পাওয়া সৌভাগ্যের, কিন্তু একে ঠিকমতো রেখে দেওয়াই কঠিন। সেই অসীম অনন্তের দান গ্রহণ করেই প্রণয়িনীর অভিসার।

রবীন্দ্রনাথ যখন লেখেন—

আমার সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায়।
আমি তার লাগি পথ চেয়ে আছি পথে যে জন ভাসায়।।
যে জন দেয় না দেখা, যায় যে দেখে—ভালোবাসে আড়াল থেকে—
আমার মন মজেছে সেই গভীরের গোপন ভালোবাসায়।।

তখন কবীরের পদাবলিতে তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে কোনো বিরোধই ঘটে না। একই কথা ভিন্ন রূপে তিনিও বলেন। এমনকী যখন রবীন্দ্রনাথে আমরা পাই—

আহা, তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা, প্রিয় আমার, ওগো প্রিয়—
বড়ো উতলা আজ পরাণ আমার, খেলাতে হার মানবে কি ও।।

তখনো কোনো বিরোধ নেই। কিন্তু যখন রবীন্দ্রনাথ বলেন—

তুমি সাধ ক'রে, নাথ, ধরা দিয়ে আমারও রঙ বক্ষে নিয়ো—
এই হৃৎকমলের রাঙা রেণু রাঙাবে ওই উত্তরীয়।।

তখনই কবীরের সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য ঘটে যায়। রবীন্দ্রনাথ যতক্ষণ বলেন—

আমায় নিয়ে মেলেছ এই মেলা,
আমার হিয়ায় চলছে রসের খেলা,
মোর জীবনে বিচিত্ররূপ ধরে
তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে।।

ততক্ষণই কবীরের সঙ্গে তাঁর কোনো দৃষ্টিভঙ্গিগত বিরোধ নেই। কিন্তু যখনই তিনি জানান—

আমায় নইলে, ত্রিভুবনেশ্বর,
তোমার প্রেম হত যে মিছে।।
... ...
তাই তো তুমি রাজার রাজা হয়ে
তবু আমার হিয়ার লাগি
ফিরছ কত মনোহরণ বেশে,
প্রভু, নিত্য আছ জাগি।
তাই তো, প্রভু, যেথায় এলে নেমে
তোমারি প্রেম ভক্তপ্রাণের প্রেমে
মূর্তি তোমার যুগলসম্মিলনে সেথায় পূর্ণ প্রকাশিছে।।

কবীরের সঙ্গে এইখানেই তাঁর ব্যবধান ঘটে যায়। কবীরের পদাবলিতে দেখা যায় ভক্তই অভিসারিকা, ভক্তের জন্যও যে বিপরীত দিক থেকে ভগবানের অভিসার হতে পারে এর সাক্ষ্য সেখানে খুবই কম। ভগবানের জন্য ভক্তের আকুলতা, তার অভিসারই, কবীরের পদে মুখ্য। এই বিষয়টি হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী লক্ষ করে লিখছেন—

"...কবীর এবং রবীন্দ্রনাথের প্রেম-লীলা এক প্রকার হয়েও মৌলিক ভেদও তাঁদের দুজনের মধ্যে রয়েছে। এক জনের কেলি যত্ন-সাধিত, অন্যজনের স্বয়ংপ্রাপ্ত; একজন নিজেকে এবং তার পৌরুষকে ভুলতে জানেন না, অন্যজন নিজেকে এবং নিজের শক্তিকে স্মরণ করতেও ভুলে যান; একজন ক্রিয়াত্মক, অন্যজন ভাবনাত্মক; একজনের পথ সাধনায়, অন্যজনের পথ সৌন্দর্যের; একজন করায় বিশ্বাস করেন, অন্যজন হয়ে-ওঠায়; একজনের প্রধান রূপ সন্ত, অন্যজনের কবি। তবু দুজনেরই প্রিয়তমের প্রেমে অখণ্ড বিশ্বাস, দুজনেরই আত্মার্পণের ভাব প্রবল, দুজনেই প্রিয়-প্রাপ্তিকে সহজলভ্য বলে মনেও করেন না, দুজনেরই প্রেম

হিস্টিরিয়াগ্রস্ত প্রেমোন্মাদনার পরিপন্থী। ('কবীর' পৃ ১৭৩)
কিন্তু "দুজনের যে বড়রকমের পার্থক্যও রয়েছে তা জানা কবীরের পাঠকদের পক্ষে জরুরি। কবীর এবং রবীন্দ্রনাথ দুজনেরই ধারণায় ভগবান ভক্তের সঙ্গে প্রেম-লীলার জন্য ব্যাকুল। এতদসত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ কবিতা এবং গানে ভক্তের কাছে ভগবান স্বয়ং অভিসার করেন, কিন্তু কবীরের অধিকাংশ কবিতায় ভক্তই অভিসারিকার কর্ম ক'রে থাকে। এমন নয় যে রবীন্দ্রনাথে কোনো জায়গাতেই ভক্ত অভিসারের জন্য বের হয় নি এবং কবীরেও ভগবান ভক্তের জন্য অভিসারের প্রযত্ন করেন নি। কিন্তু সামগ্রিকভাবে কবীরের ভক্ত অভিসারের জন্য স্বয়ং প্রযত্ন করে, যেখানে রবীন্দ্রনাথের ভগবান নিরন্তর অভিসারী।" (ঐ পৃ ১৬৯)

কবীরের ভগবান যে ভক্তের জন্য অভিসার করেন তার সাক্ষাৎ ক্ষেত্রবিশেষে এরকম—

সুতল রহলুঁ মৈঁ নীদ ভরি হো পিয়া দিহলৈ জগায়।
চরণ কঁবলকে অঞ্জন হো নৈনা লে লূঁ লগায়।।

(দ্র ৩৫ সংখ্যক অনূদিত পদ)

প্রিয় এসে তাঁর ঘুমন্ত প্রণয়িনীকে জাগাচ্ছেন। আর সেই প্রণয়িনী তাঁর চরণ-কমলের অঞ্জন নিজের চোখে পড়ে নিচ্ছে।
অপরদিকে রবীন্দ্রনাথেও আমরা যেমন পেয়ে যাই—

আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরাণ সখা বন্ধু হে আমার।

(গীতাঞ্জলি ২০)

কিংবা,

আমার মিলন লাগি তুমি
আসছ কবে থেকে
তোমার চন্দ্র সূর্য তোমায়
রাখবে কোথায় ঢেকে।
কত কালের সকাল-সাঁঝে
তোমার চরণধ্বনি বাজে,
গোপনে দূত হৃদয়মাঝে
গেছে আমায় ডেকে।

(গীতাঞ্জলি ৩৪)

আবার প্রণয়িনীরও তো অভিসার হয় তার প্রণয়ীর উদ্দেশে—

একলা আমি বাহির হলেম
তোমার অভিসারে,
সাথে সাথে কে চলে মোর
. গভীর অন্ধকারে।
ছাড়াতে চাই অনেক করে
ঘুরে চলি, যাই যে সরে,
মনে করি আপদ গেছে,
আবার দেখি তারে।

(গীতাঞ্জলি : ১০৩)

কবীর এবং রবীন্দ্রনাথে, উভয়ক্ষেত্রেই আরো যেটি লক্ষণীয় হয়ে ওঠে—ভক্ত এবং ভগবানের

প্রণয়-সম্পর্কে পরস্পরের সম্বন্ধ বধূ আর বরের। 'খেয়া'-র 'বালিকা বধূ' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ সেকালের বালিকা বধূকে যেভাবে চিত্রিত করেন, তার সামাজিক বাস্তবতাকে লক্ষ করেও ভাবব্যঞ্জনায় তা যেমন আরো গূঢ় অর্থ বহন করে, তেমনি কবীরের পদাবলিতে বালিকা বধূর যে ছবি আমরা পাই, তাও সেদিনের লোকজীবনের পরিপ্রেক্ষিত ছাড়িয়ে আরো ব্যাপক অর্থে আমাদের কাছে পরিস্ফুট হয়। রবীন্দ্রনাথ 'বালিকা বধূ' কবিতায় যখন বলেন—

ওগো বর, ওগো বঁধু,
এই যে নবীনা বুদ্ধি বিহীনা এ তব বালিকা বধূ।
তোমার উদার প্রাসাদে একেলা
কত খেলা নিয়ে কাটায় যে বেলা—
তুমি কাছে এলে ভাবে তুমি তার খেলিবার ধন শুধু
ওগো বর, ওগো বঁধু।।

জানে না করিতে সাজ।
কেশবেশ তার হলে একাকার মনে নাহি মানে লাজ।
দিনে শতবার ভাঙিয়া গড়িয়া
ধুলা দিয়া ঘর রচনা করিয়া
ভাবে মনে মনে সাধিছে আপন ঘরকরণের কাজ।
জানে না করিতে সাজ।।

তার এই খেলাঘরের বরটিকে তো একদিন সে বুঝতে পেরেই বলে—

তোমায় নিয়ে খেলেছিলেম খেলার ঘরেতে।
খেলার পুতুল ভেঙে গেছে প্রলয় ঝড়েতে।
থাক্ তবে সেই কেবল খেলা, হোক না এখন প্রাণের মেলা—
তারের বীণা ভাঙল, হৃদয়-বীণায় গাহিরে।।

প্রলয়-ঝড়ে যখন খেলার পুতুল ভেঙে যায় তখনই তো কবি জানান—

শুধু দুর্দিনে ঝড়ে—
দশ দিক ত্রাসে আঁধারিয়া আসে ধরাতলে অম্বরে,
তখন নয়নে ঘুম নাই আর,
খেলাধুলা কোথা পড়ে থাকে তার—
তোমারে সবলে রহে আঁকড়িয়া, হিয়া কাঁপে থরথরে—
দুঃখদিনের ঝড়ে।।

বাসকশয়নে থেকেও যে বালিকা বধূ বরের বাহুতে 'অচেতন ঘুমভরে' ছিল, সেই তো একদিন উপলব্ধি করে অবশেষে বলে—

আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে দেখতে আমি পাই নি।
তোমায় দেখতে আমি পাই নি।
বাহির পানে চোখ মেলেছি, আমার হৃদয় পানে চাই নি।।

অনুরূপ উপলব্ধি থেকেই তো কবীরের কবিতায় প্রণয়িনী বলে ওঠে—তুমি আমার নয়ন -অন্তরে এলে আমি চোখ বুজে ফেলব। আমি আর কাউকে যেমন দেখব না, তোমাকেও তেমনি আর কাউকে দেখতে দেব না।

আর এই প্রণয়িনীর অভিসার যেখানে, তার সম্পর্কে কবীরের পদাবলিতে বিচিত্র সব কথা পেয়ে যাই। অনিবার্যভাবেই তখন মনে পড়ে যায় রবীন্দ্রনাথের 'খেয়া' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত

সব-পেয়েছি'র দেশ' কবিতাটি। কবীরের পদাবলিতে প্রিয়র উঁচু অট্টালিকা দেখবার জন্য প্রিয়তমার যে অভিসার, সেখানকার ছোটখাট খবর কবীর যা দেন, সেখানে যাবার জন্য যে প্রস্তুতির কথা বলেন, তা যে কঠিন আয়াসসাধ্য সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহই নেই। কেননা তিনি একথাও বলেন—

বহুরি নহি আবনা যা দেস।
জো জো গয়ে বহুরি নহি আয়ে পঠবত নহি সংদেহ॥

(দ্র ৭৭ সংখ্যক অনূদিত পদ)

সব-পেয়েছি'র দেশটি কেমন? রবীন্দ্রনাথ বলছেন—

সব-পেয়েছির দেশে কারো
নাই রে কোঠাবাড়ি,
দুয়ার খোলা পড়ে আছে,
কোথায় গেল দ্বারী।
অশ্বশালায় অশ্ব কোথায়,
হস্তীশালায় হাতি,
স্ফটিকদীপে গন্ধতেলে
জ্বালায় না কেউ বাতি।
রমণীরা মোতির সিঁথি
পরে না কেউ কেশে,
দেউলে নেই সোনার চূড়া
সব পেয়েছি'র দেশে।
... ...
নাইকো পথে ঠেলাঠেলি,
নাইকো হাটে গোল,
ওরে কবি এইখানে তোর
কুটির খানি তোল।
ধুয়ে ফেল্ রে পথের ধুলো,
নামিয়ে দে রে বোঝা,
বেঁধে নে তোর সেতারখানা,
রেখে দে তোর খোঁজা।
পা ছড়িয়ে বোস রে হেথায়
সারা দিনের শেষে,
তারায়-ভরা আকাশ-তলে
সব-পেয়েছি'র দেশে।

কিন্তু এইখানে নিশ্চিন্তমনে সেতার হাতে যে কবি বসবে, কী পাবে সে, আর এই নিশ্চিন্ত মনই বা তার আসবে কোত্থেকে? কী দেখে এখানে সন্ত আর কবি শমিত হতে পারেন, সুনিশ্চিত হন? কবীর বলছেন—

হরি-সংগতি সীতল ভয়া, মিটী মোহ কী তাপ।
নিসি-বাসর সুখ-নিধি লহ্যা, জব অন্তরি প্রগটিয়া আপ॥
তন পায়া তন বীসরা, জব মন ধরিয়া ধ্যান।
তপন গঈ সীতল ভয়া, জব সুন্নি কিয়া অসনান॥

তাহলে বোঝা গেল অসীম-অসন্ত শূন্যে স্নান করে সমস্ত বেদনা শান্ত হয়ে গেছে। সব কথা, সমস্ত প্রদর্শন উপশমিত হয়েছে। যা ছিল অনুসন্ধানের, স্বয়ং সে যখন এসেই গেছে, তখন আর

কীসের বেদনা, চাঞ্চল্যই বা কীসের?
কবীর বলছেন—

> হদ ছাড়ি বেহদ গয়া, রহা নিরন্তর হোয়।
> বেহদ কে মৈদান মে, রহা কবীরা সোয়।।

রবীন্দ্রনাথও কি একটু অন্যরকমভাবে বলেন নি?—

> সীমার মাঝে অসীম তুমি
> বাজাও আপন সুর।
> আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ
> তাই এত মধুর।
>
> (গীতাঞ্জলি : ১২০)

'জীবনমরণের সীমানা ছাড়ায়ে' যে-বন্ধু দাঁড়িয়ে থাকেন, তাঁর সম্পর্কেই তো কবীর বলেন—

> হদ চলে সো মানবা, বেহদ চলে সো সাধ ॥
> হদ বেহদ দোউ তজে, তাকর মতা অগাধ ॥
>
> (দ্র ১৪ সংখ্যক অনূদিত পদ)

সেই অরূপেরই তো 'রূপের লীলায় জাগে হৃদয়পুর'। অসীমের প্রতি টানেই তো এভাবে কবীর আর রবীন্দ্রনাথের ভেতর আশ্চর্য এক সেতুবন্ধন সম্ভব হয়ে ওঠে। তাই রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন—

> প্রভু আমার, প্রিয় আমার পরম ধন হে।
> চিরপথের সঙ্গী আমার চিরজীবন হে।।
> তৃপ্তি আমার, অতৃপ্তি মোর, মুক্তি আমার, বন্ধন ডোর,
> দুঃখসুখের চরম আমার জীবন মরণ হে।।
> আমার সকল গতির মাঝে পরম গতি হে,
> নিত্য প্রেমের ধামে আমার পরম পতি হে।
> ওগো সবার, ওগো আমর, বিশ্ব হতে চিত্তে বিহার—
> অন্তবিহীন লীলা তোমার নূতন নূতন হে।।

মনে হয় না তখন একথা কেবলই রবীন্দ্রনাথের। একথা কবীরেরও।
"কিন্তু কবীর পরম সাবধানতার সঙ্গে পাঠককে শব্দের সংকীর্ণ অর্থ ছাড়তে বলেন। 'বেহদ' শব্দের সাধারণ অর্থ এই, যা হদ নয় বা হদের বিরুদ্ধ যা। একথা আংশিক সত্য। বস্তুত সীমা অসীমের বাইরে নয়, তার বিরোধীও নয়; তার অভাব তো একেবারেই নয়। এইকারণে বেহদের প্রতি প্রীতির কথা বলার সময় কবীরদাস সাবধান করে দেন। একে সীমার বিরোধী বলে মনে করা ভুল। বেহদ তা-ই, যা সীমা এবং সীমাভাবের পরে। যা হদ এবং গর-হদ দুয়েরই উপরে। এই হদ-বেহদের অতীত বস্তুকে ভাবার সীমিত শক্তির কারণে কবীর দাস 'বেহদ' বলেছেন। হদ বা সীমার ভেতর মানুষ বাস করে, বেহদ বা সীমাভাব যাতে সাধু বাস করেন, কিন্তু প্রকৃত সন্ত সেইজন যিনি এই দুটিকেই ছেড়ে গেছেন, যিনি সীমাতীত অসীমের প্রেমিক।" ('কবীর' পৃ ১৮৩-১৮৪)
তাই কবীর বলছেন—

> হদ মে রহৈ সো মানবী, বেহদ রহৈ সো সাধু।
> হদ-বেহদ দোনৌ তজৈ, তিনকা মতা অগাধু।
> হদ-বেহদ দোনৌ তজী, অবরন কিয়া মিলান।
> কহৈ কবীর তা দাস পর, বারৌঁ সকল জহান।।

অরূপকে রূপান্বিত করার চেষ্টাই কবীর করেছেন। সাখী, পদ, শব্দ আর দোহা—এসব হয়তো সাধন-মার্গও এক হিশেবে। যতক্ষণ না পরমপ্রিয়র সঙ্গে মিলন হয়, এসবের ভেতর দিয়েই ভক্তের প্রয়াস ততক্ষণ চলতে থাকে। লক্ষ্যে পৌঁছলে তখন আর মার্গ নিয়ে কীসের হিশেব। সাধনাকে বুঝতে গেলে তো সাধনাই করতে হয়—সাখী, শব্দ, দোহার ব্যাখ্যানে কি আর সাধনার মর্ম উপলব্ধি করা যায়। তবু সেই গূঢ় অনুভব শেষ অবধি শব্দের আভাসে, ভাষার সংকেতেই উনজনকে আত্ম-সাক্ষাৎকারের সুযোগ করে দেয়। কবীরের পদাবলি, রবীন্দ্রনাথের গানের কথা আমাদের হৃদয়পুরে তো সেই শব্দ-গানেরই উদ্বোধনে সহায়ক হয়ে ওঠে।

কবীরের সঙ্গে পরিচয় : আগুন আর রক্তের তিমিরে

কবীর-পদাবলির সঙ্গে প্রথম পরিচয় ছাত্রাবস্থায়, অবনীন্দ্রনাথের 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী' পড়ার সূত্রে।

"পানি পিয়াওত ক্যা ফিরো
ঘর ঘর সায়র বারি।
তৃষ্ণাবংত যো হোয়গা
পীবেগা ঝকমারি।"
বা
"পানী বিচ মীন পিয়াসী
মোহি সুন সুন আওত হাঁসি।"

এসবের পূর্ণ মহিমা সেদিন সম্যক উপলব্ধি হয় নি। অবনীন্দ্রনাথের ভাষার যাদুতে মন সরস হয়েছিল, কিন্তু কবীরের প্রাসঙ্গিকতা তত ভাবায় নি। ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারায় কবীর যে অন্যতম প্রাণপুরুষ, এই তথ্যটুকু ইতিহাস বইয়ের পাতায় যেমন ধরা ছিল, সেভাবেই অবগত হই। তার অতিরিক্ত কোনো ধারণা গড়ে ওঠে নি।
পরবর্তী সময়ে কবীরের পদাবলির কিছু ইংরেজি অনুবাদ বিক্ষিপ্তভাবে দৃষ্টিগোচর হয়েছে। যেমন, রবীন্দ্রনাথকৃত কবীর-অনুবাদের অংশবিশেষ, বা সাহিত্য আকাদেমি থেকে প্রকাশিত প্রভাকর মাচয়ে-র 'কবীর' পুস্তকে। এ সমস্তই ভারতীয় সাংস্কৃতিক ইতিহাসের তথ্যসন্ধানের বাসনা চরিতার্থ করতে ঘটেছে। পাঠকের আগ্রহী ভূমিকাই এসব ক্ষেত্রে প্রধান।

কিন্তু বর্তমান পর্যায়ে কবীরের পদাবলি থেকে নির্বাচিত কয়েকটির ভাষান্তরে অনিবার্য কারণ নিশ্চয় আমাদের দেশ আর কালের পটভূমিতেই নিহিত। উপেন্দ্রকুমার দাসের 'ভক্ত কবীর' গ্রন্থটি পড়ার সূত্রে যেমন কবীরকে তাঁর যথাযোগ্য মর্যাদায় উপলব্ধি করি। তেমনি হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদীর 'কবীর' গ্রন্থটি পড়ার সূত্রে কবীর-সম্পর্কিত ধারণা আরো কিছুটা বিস্তৃত হয়। কবীর-সংক্রান্ত নানান তথ্যাদি এবং তাঁর পদাবলির ভেতর দিয়ে ভারতীয় মধ্যযুগে হিন্দু-মুসলমানের সাধনার ঐক্যের রূপটিই যে বিশেষ করে স্থায়ীভাব হয়ে উঠতে থাকে, তা বর্তমান ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে হয়।
হিন্দি ভাষামাতৃক সাহিত্যেই শুধু নয়, হিন্দি-বলয়ের জনমানসে যাঁর স্থান চিরপ্রণম্য, সেই কবীরের পদাবলির বঙ্গিকরণে যতই অগ্রসর হয়েছি ততই মনে হয়েছে, ভারতবর্ষের বহুধা বিস্তৃত যুগযুগান্তের সাধনার সঙ্গে বহির্ভারতীয় ইসলামের , সুফি ভাবধারার সমন্বয়ে সময়তরঙ্গে ভারতের সংস্কৃতির যে দার্শনিক পটভূমি গড়ে উঠেছে, লোকায়ত কবীর সেখানেই এক তরঙ্গবিশেষ। ভারতবর্ষের সমন্বয়ী চিন্তাধারার ধারক এবং বাহক হিশেবে কবীর তাঁর জীবন আর সাধনার ভেতর দিয়ে তাঁর কাল থেকে কালান্তরে এমন এক সামঞ্জস্যের প্রতীক হয়ে উঠেছেন, যেখানে আমাদের কালের ধর্মনীতি আর রাজনীতির সামঞ্জস্যনাশক বিষাক্ত পরিমণ্ডলে তাঁর বাণীরূপে দ্যুতিস্নাত হওয়াতেই তাঁর প্রাসঙ্গিকতাকে উপলব্ধি করা যাবে।

কবীর লোকায়ত বলেই তাঁর পদাবলির ভাষান্তরে বাংলার লোকায়ত বাণীতেই আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদিত হতে পারে। এই বিবেচনায়, ভাষান্তরে পদগুলির শরীরে কখনো কিছুটা অমার্জিত

কথ্যভাষার সংস্থান করতে হয়েছে। বিভিন্ন সাধন-সম্প্রদায়ের নিজস্ব পার্থক্য সত্ত্বেও সামগ্রিকভাবে যাঁদের বাংলার বাউল সম্প্রদায় বলে জানি, তাঁদের গানের ভাষার উপরিতলের রূপটিকে কিছুটা অনুসরণ করার চেষ্টা করেছি কিছু পদে। যেসব ক্ষেত্রে মার্জিত ভাষা ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছে তা করতেও কার্পণ্য ঘটে নি। সাধু এবং চলিত ক্রিয়াপদের কোনোটিকে গ্রহণ করব—এ নিয়ে কোনো প্রাকসিদ্ধান্ত যে অচল হতে পারে ভাষান্তর কর্মে যে কোনো মুহূর্তে, তা কাজের সময়েই হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি। প্রতিটি মুহূর্তে সময়ের উজান ঠেলে অগ্রসর হতে হয়েছে। আর তা হয়েই বোঝা গেল, আমাদের প্রিয় বাংলাভাষাটির আঁতুড় ঘরের কান্না, শৈশবাবস্থার দেয়ালা। বসন্তকর্ণিক হাতে চেনা-অচেনা জানা-অজানা কত ধাত্রীদেবতার কর্মশালা চঞ্চল হয়ে গড়েপিঠে তুলেছে স্নেহের বঙ্গভাষা—তার অস্থিমজ্জা, মর্মপ্রকৃতির আশ্চর্য সংস্থান। আউধী মাগধী কত বিচিত্র স্পর্শে গড়ে উঠেছে নবীন রক্তস্রোত—কত বিচিত্র অভিযান! তাই কবীরের ভাষার সঙ্গে মৈথিলী বিদ্যাপতির ব্রজভাষার সম্পর্ক খুব দূরান্বয়ী বলে মনে হয়নি। ভাবের দিক থেকে লালনের সঙ্গেও সম্পর্ক তাঁর নিকট আত্মীয়ের। এমনকী যে কবীর শাক্তদের ওপর রীতিমতো বিরূপ ছিলেন সেই শাক্তসাধক কমলাকান্ত ভট্টাচার্যর কোনো কোনো গানেও কবীরের বক্তব্য উপস্থিত বলে মনে হয়েছে, মনে হয় নি পূর্ববর্তী রামপ্রসাদ সেনও কোনো ভিন্ন কথা বলছেন। এমনকী কবীরের ঈশ্বর-সংক্রান্ত দার্শনিকপ্রজ্ঞা কোন ঐতিহাসিক পটভূমিতে সহজিয়া হয়ে উঠল, লোকায়ত সাধনার কোনো পরিপ্রেক্ষিতে কবীর তাঁর 'এক'-এর উপলব্ধিতে পৌঁছলেন, এই ধরণের নানা প্রশ্নের অনুসন্ধান করতে গিয়ে মনে পড়েছে বাংলার ধর্মমঙ্গলের পুরাণ-পাঁচালির কথাও, রামাঞি পণ্ডিত যেখানে বলছেন—

ধর্ম হৈলা জবনরূপি মাথাএ ত কাল টুপি
হাতে সোভে ত্রিকচ কামান।
চাপিআ উত্তম হয় ত্রিভুবনে লাগে ভয়
খোদায় বলিয়া এক নাম॥
নিরঞ্জন নিরাকার হৈলা ভেস্ত অবতার
মুখেত বলে ত দম্বদার।
জতেক দেবতাগণ সভে হয়্যা একমন
আনন্দেতে পরিল ইজার।
ব্রহ্মা হৈল মহাম্মদ বিষ্ণু হৈলা পেকাম্বর
আদম্ফ হৈল সুলপানি।
গনেশ হৈল কাজী কার্তিক হৈল গাজী
ফকির হইল্যা যত মুনি॥
তেজিয়া আপন ভেক নারদ হইলা সেক
পুরন্দর হইল মলনা।
চন্দ্রসূর্য আদি দেবে পদাতিক হয়্যা সেবে
সভে মিলি বাজায় বাজনা॥

যদিও এসব কথা কবীরের জীবৎকালের অনেক পরের। তবু মনে হয় কবীরকে জানতে গেলে এসবের অনুসন্ধানও অপ্রয়োজনীয় নয় কোনোভাবেই।

যে সত্যধর্মের জন্য কবীর তীর্থ-ব্রত-আচার-প্রতীক-সাম্প্রদায়িকতাকে ত্যাগ করেছিলেন, প্রেমে ভক্তিতে কর্মে যে সহজ-সাধনার ভিত্তি তাঁকে লোকায়ত করে তুলেছে, তাঁর বাণী যে তাঁকে একই সঙ্গে সাধক ও কবি হিশেবে আমাদের ভাবায়, সেই তাঁকেই আমাদের মতিচ্ছন্ন সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা ভাষান্তরে পাওয়ার এই সামান্য আয়োজন যদি পাঠকদের হৃদয়বত্তার কাছে

বিন্দুমাত্র আন্দোলন পায়, তাহলেই যথেষ্ট। কবীর যে বাস্তবিকই আমাদের চৈতন্য ফেরাতে পারেন, তিনি যে সুদূর অতীতের মধ্যে আবদ্ধ থেকে প্রত্নশালার সামগ্রী নন মাত্র, তাঁর জীবন এবং দর্শনের ওপর ভিত্তি করে যে আমাদের কালের কথাও আমরা বলতে পারি নিদারুণ সংকটের সময়, এই সত্য ভারতীয় নাট্যসমাজের কেউ কেউ উপলব্ধি করেছিলেন। ভীষ্ম সাহনির 'কবীরা খাড়া বাজারমেঁ' তারই প্রকাশ। বাংলা রঙ্গমঞ্চে চেতনা নাট্যগোষ্ঠীর 'কবীর' প্রযোজনা সেই সত্যকেই সাধারণের কাছে উপস্থিত করেছিল।

জীবনানন্দ লিখেছিলেন—

মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব
থেকে যায়, অতীতের থেকে উঠে আজকের মানুষের কাছে
আরো ভালো—আরো স্থির দিক নির্ণয়ের মতো চেতনার পরিমাপে নিয়ন্ত্রিত কাজ
কতদূর অগ্রসর হয়ে গেল জেনে নিতে আসে।

কবি জীবনানন্দের এই প্রজ্ঞা এত মর্মান্তিকভাবে স্মরণীয় হয়ে উঠবে তা কি জানতাম! যদি না শতাব্দীর উপান্তে এসে এক অদ্ভুত আঁধার ধর্মকে কেন্দ্র করে দেখতে হত? রক্ত আর অগ্নিবাষ্পজালের সমারোহে কোন ধর্মকে পেতে চায় ধর্মগ্রন্থের অভিভাবকরা—এই প্রশ্নে যদি না বিক্ষত হত ভবিষ্যতের কাছে কৈফিয়ৎ দেওয়ার দায়বোধহীন, ভদ্রতার প্রতিযোগিতায় অভ্যস্ত দৈনন্দিনে জনৈক উনমানুষের অন্তরগত লজ্জাবোধ!? অর্থহীন প্রকৃতির ভেতর নিজের অস্তিত্বকে অর্থময় করে তোলা যদি মানুষের সাধনা হয়, তাহলে বলতেই হবে, এত আগুন এত রক্তের তিমিরে মধ্যযুগের কবীর সাম্প্রতিকে স্মরণীয় হয়ে উঠলেন তাঁর মানবতন্ত্রী চেতনার কল্যাণেই। প্রকৃতপক্ষে যে প্রেমের সাধনায় ছিল তাঁর বীরত্বের সাধনাই, নির্ভীক সাহস যাঁর সংগ্রামের অস্ত্র, সেই কবীরকে এই মুহূর্তে স্মরণ না করলে মানবজমিনও যে আবাদ করা যায় না, পতিতই রয়ে যায়।



কবীর-পদাবলি

১

কে বুনবে রে? প্রেম লেগেছে। বুনবে তানা কে?
রাম-রসায়ন পানে, ও মা, মন যে মেতেছে।
জট ছাড়াতে গুছি দিলাম—ভাবলি, ও মা, শোন,
ওই তুরি তোর বেচে খেলাম, বুনবে কে এখন!
প্রেমরসে যা পাই চুয়ানি, সুতায় দি গো সেই রসানি—
নাচল তানা, পোড়েন নাচে, আর করেকার গুছিও নাচে,
তাঁতঘরে তোর কবীর বসে জুড়ল মাগো কী নাচখানা!
ইঁদুর শেষে কাটল তানা, বুনবে কে রে বুনবে তানা!
বল মা, কে রে বুনবে তানা, বল?

২

জোলা, তুই বুনবি রে তোর হরিনামের তানা।
সুর-মুনি-নর শুতেই দিল যে যার আপন মনখানা।
তানার ভিতর আঙুলপ্রমাণ করবি রে তোর মাপখানা,
চার বেদে কর চরকি এখন,
নাটাই যে তোর রামনারায়ণ—পূর্ণপ্রকাশ সেইজন্য।
ভবের সাগর কর কটোরা, ওইখানে তোর রাখ না মাড়ি
মাড়ির মনেই রয় যে মাড়ি, সেও জানে যে বিরলজনা।
চাঁদ-সুরুযের গোড়ায়, ও তোর মাঝ-দীপে তুই মাঞ্জা নিবি,
তিন ভুবনের নাথ রে যখন মাড় মোছে, তুই বাঁধনা দিবি—
শ্যামগিন্টে তুই বাঁধনা দে না!
সাফ করে তুই সুতায় রে তোর রামনামে বাঁধ পোড়েন-টানা।
ভরনা যখন হলই সাধা, তিন খেয়া তোর পড়ল বাঁধা,
রইবে না তোর তানায় ওরে কোনোই ঝালর-ঝুলখানা।
তিন লোকে এক তাঁতশালা কর, ভিন্ন ভিন্ন রাখ তানা।
মন করে তোর আদিপুরুষ, পারলে বসা সেইজন্য।
কবীর বলে, লীন হল সে ওই জ্যোতিতে এই তানা।

৩

কোথায় খুঁজিস বান্দা আমায়
রয়েছি রে তোর পাশে;
মন্দিরে মসজিদেও তো নেই—
কাবায় ও কৈলাসে।
নেই আমি কোনো ক্রিয়ায় কর্মে,
যোগবৈরাগে নেই;
খুঁজলেই পাবি তুরন্তে, তোর
একটুকু পালকেই।
কবীর বলছে, শোন সাধু, ভাই
প্রাণের প্রাণেই তাঁর বুঝি ঠাঁই।

৪

আমার নিরঞ্জন আর আল্লা একই আছে।
হিন্দু তুরুক দু নয় আমার কাছে।
আমি ব্রত না রাখি, জানি না মহরম,
নিদানে রয় যেজন আমি তাঁকেই করি স্মরণ।
আমি পুজো না করি, নমাজ করি না,
আমার সকল নমস্কার যে হৃদয়ে নিরাকার।
আমি হজ না করি, তীর্থ পূজি না,

আমি 'এক' চিনেছি   দুয়ের খোঁজে নাই;
ভ্রমটা গিয়ে মন লাগালাম নিরঞ্জনে ভাই।

৫

পুজো-সেবা-নিয়ম-ব্রত   ছোট মেয়ের পুতুলখেলা।
প্রিয়-ছোঁয়া না পেয়ে তোর   এত সংশয়ের মেলা।

৬

মুরশিদ, তোর নয়নমাঝে আছেন নবী।
তোর চোখের শাদা কালোর মাঝে তারার পিছে অলখ কবি।
আঁখির মাঝে পক্ষ্ম নাচে   পক্ষ্মমাঝে দ্বার,
ওই দ্বারে এক দূরবিন দিয়ে ভবসাগর পার।
আমার বাস যে শূন্যশহর সব দিয়ে সেথা যায়
সাহেব কবীর নিত্যসাথী, শব্দমহল তায়।

৭

জলের ভেতর মাছ পিয়াসী,
শুনে আমার পাচ্ছে হাসি;
ঘরের বস্তু নজর কাড়ে না,
বনে বনে ফেরে উদাসী।
আত্মজ্ঞানহীন জগৎ বৃথা
কী মথুরা কী বা কাশী।

৮

সীমা ছেড়ে অসীমে যাই, শূন্যে করি চান;
মুনিজনে মহল না পাক করেছি বিশ্রাম।
দেখো হে তবে কবীর-কর্মটি! লিপি তো কিছু পূর্বজন্মের।
যাঁর ভবনে মুনিরও বাধা, বন্ধু সে যে অলখ পুরুষের।

৯

খোদার যদি মসজিদে বাস, আর মুলুকটা কার?
তীর্থ মূর্তি রাম-নিবাসী, বাইরে খোঁজটা ছাড়।
পূবদিকে যদি হরির বসত, পশ্চিমে তবে আল্লা-মোকাম,
মনের ভেতর খোঁজ করে দ্যাখ, মনেই আছেন করিম ও রাম।
রয়েছেন যত পুরুষ-নারী, সকলের এই রূপ তোমারই।
কবীর আল্লা-রামের ছেলে, পীর গুরু সে তাঁকেই পেলে।



১০

এমন বিভেদ বেয়াড়া ভারী।
বেদ-কেতাব কী দীন, দুনিয়া, পুরুষ এবং নারী।
এক রুধির এক মলমূত্র একই চাম এক মাস—
কে বাউন আর শুদ্দুর কে, একই বিন্দুবাস।
মাটির পিণ্ড সহজসৃষ্টি, নাদ ও বিন্দু যায়
মরণ হলে কী নাম হবে তায়,
পড়ায়শোনায় মর্ম কে তার পায়!
ব্রহ্মা রজোগুণেই সেজন, শিব সে তমোগুণেই, সত্ত্বে হরি সেই।
এক রামের এই নাম জপো রে—কবীর বলে—হিন্দু-তুরুক নেই।

১১

আমি এক-কে একই জানি।
কেউ বলে দুই, তিন বলে কেউ,
চিনল না রে, দোজখ তারই।
এক পবন আর একই পানি
এক জ্যোতি সে যাক যেখানই।
একই কুমোর, একটা মাটি,
গড়ল রে ভাই কী ভাঁড়খানা।
মায়ায় দেখে লুব্ধ হল
সক্কলে—এই জগৎখানা।
গর্ব কেন করলি মানব?
কবীর বলে, শোন সজনা—
গুরুর হাতে বিকিয়ে দিতে
কুণ্ঠা কেন তোর আপনা!

১২

যাস না রে তুই যাস না বাগানে।
ফুল ফোটে তোর দেহে।
ও তোর করণ হল কেয়ারি, আর হাবভাবটাই প্রহরী,
দুর্মতি কাক উড়ছে রে তোর সব নষ্টায় সেখানে।
মনমালী দেয় বুঝেসুঝে সংযমেরই বেড়া,
দয়ার খোরায় ক্ষমার পানি ঢাল না আগাগোড়া।
ফুল আর বাগের মধ্যে ফুটল আজব গোলাপ যে,
মুক্তিসুতোয় গাঁথবি সত্যনামের মালা রে।
অষ্ট কমল পেরিয়ে লীলা অগম অনন্তের
কবীর বলছে, নেই আসা-যাওয়া চিত্তচেতনের।

১৩

এই ঘটের ভিতর বাগ-বাগিচা,
এইখানে যে সৃজন সারা।
এই ঘটের ভেতর সাতটি সাগর
এইখানে ন লক্ষ তারা।
এই ঘটের ভিতর পরশমণি
এইখানে সেই রত্নবণিক।
ঘটেই শব্দব্রহ্ম গর্জে
ঘটেই উঠল এক ফোয়ারা।
কবীর বলছে, শোন রে সাধু,
এইখানে সাঁই পাই যে সাড়া।

১৪

সীমার মাঝে চলে মানব, অসীমে চলে সন্ত।
সীমা অসীম দুটোই ছাড়ে, যেজন অতলান্ত।

১৫

অঞ্জন অলয়, আর নিরঞ্জন সার।
এই বুঝে তবে আজ করো গো বিচার।
উদ্ভব অঞ্জন, তারো বিবর্তন হয়।
নিরঞ্জন বিনা ভাই কোনো মুক্তি নয়।
আগম অঞ্জন আর নির্গমনও তাই।
নিরঞ্জন সর্বঘটে রয়ে যান ভাই।
যোগ-ধ্যান-উপাসনা—প্রমাদ সে হয়।
কবীর বলে তো রাম আমার আশ্রয়।

১৬

গগনে ঘনঘটা, ও সাধু, ঘনঘটা গগনে।
পুবে যে উঠল রে বাদর ওই আর ঝরল রিমঝিম তায়।
আপনাপন খেতে বাঁধ রে আল বাঁধ
জল যে বয়ে যায়, যায়।
সুরতি নিরতির বলদে হাল জুড়ে করল চাষ নির্বাণী,
ধান যে কেটে তার নিজের ঘরে আসে
সে হয় কর্মঠ কিষাণই।
সমুখে দুটি পাত, সেখানে খাচ্ছেন দুজনা—জ্ঞানী আর মুনি।

১৭

তিমির সন্ধ্যা ঘনাল ওই, প্রেমছায়া দেহ-মনে।
পশ্চিম দিকে খিড়কি খুলে ডুব দিবি তুই প্রেম-গগনে।
চিৎকমলের রস খানা তুই, তরঙ্গ নিস দেহে,
শঙ্খ-ঘণ্টা-সানাই বাজল শোভাসিন্ধুর গৃহে।
কবীর বলছে, শোন সজ্জন, ঘটের মধ্যে দ্যাখ না এখন
অমর আত্মজনে।

১৮

গগন-গুহায় অঝর রস ঝরোঝরো।
না বাজে বাজন রে, উঠল ঝংকার,
ধেয়ানে বুঝাওত যায়।
না সেথা পুকরিণী, ফুটল কমলিনী—
হংস কেলি করে চড়ল তায়।
না ওঠে চন্দ তো, দরশে চন্দালো।
নজরে ইতিউতি হংস ধায়।
দশম দ্বারে যোগী অলখ পুরুষক
ধেয়ানে দরশন পাই।
করাল কাল তার নিকটে নাহি ওরে,
কামনা-ক্রোধ-মদ-লোভন নাই।
যুগে-যুগান্তরে তৃষ্ণা মিটাওল,
করমভরমআদিব্যাধিও যায়।
কবীর ভণয়ল, শুনো রে সজ্জন লো,
অমর হয়, তার মৃত্যু নাই।

১৯

বঁধুয়ার রঙে রাঙা হল এই চরাচর, আহা, কী বিস্তীর্ণ—
ওই রাগারুণ দেখতে গিয়ে যে আমিও হলাম রক্তকীর্ণ।
কত লোক ঘোরে দেশ-দেশান্তে, সবই তো বঁধুয়া পাওয়ার জন্য।
আমার বঁধুয়া এলে আঙিনায় সেই তো বিদেশ—মিলনধন্য!

২০

স্বপ্নে পেলাম সাঁইকে আমার,
ঘুম থেকে সাঁই তোলে।
ভয়ে থাকি, চোখ মেলি না, কারণ
স্বপ্নটা ভাঙে বলে।

কত গুণ ধরে সাঁই যে আমার—
লিখেছি হৃদয়তলে,
ভয়ে থাকি, জল খাই না, কারণ
লিখন মুছবে জলে।

২১

উচাটন হল প্রিয়ের বিরহে মন।
দিনে অশান্তি, রাতে অনিদ্রা,
উচাটনে গেল সবকিছু অনুক্ষণ
দেহমন কাঁপে চরকার মতো শুধু,
শূন্য শয়নে জীবন হয়েছে ধু ধু,
চেয়ে চেয়ে চোখ ভারী হয়ে আসে—
পন্থা খুঁজে না পাই,
নিঠুর বঁধুয়া খোঁজ করে না তো,
কবীর বলছে তাই—
বিরহকাতর হয়েছ, কিন্তু সন্তাপ করো দূর।

২২

স্বামীর সঙ্গে এলাম শ্বশুরবাড়ি।
তার সঙ্গ পাই নি, স্বাদ জানি না তো,
যৌবন যায় স্বপ্নের মতো,
সখী-সজনীরা মঙ্গল-গান গায়,
সুখ-দুঃখের হলুদ দেয় মাথায়।
বিয়ে হল, তবু বর ছাড়া আমি একাই চলেছি, ভাই—
স্বজন-আত্মীয় পন্থা দেখাল তাই।
কবীর বলছে, গৌনার পর শ্বশুরবাড়ি তো যাব—
তূর্য বাজিয়ে তখন আমার কান্তকে ঠিকই পাব।

২৩

কনে বউ, কেন আঙিয়া ধুসনি তুই?
আঙিয়াটি তোর ছুকরীবেলার, রইল যে তার বিষয়-দাগ,
প্রিতমটি তোর খুশ না হলে শেজ থেকে ফেলে করবে রাগ।
স্মরণ-ধ্যানের সাবান নে তুই, সত্যনামটি কর দরিয়া,
দ্বৈত-ভাবটা ছাড় না, ও বউ, মনের ময়লা ধুক সে তোয়া।
দ্যাখ ভেবে তুই—তিন দশা তোর কাটল, স্বামীর মোকাম চল,
ভাতার যে তোর রয় দুয়ারে, পস্তিয়ে কী করবি বল!
কবীর বলছে, শোন কনে বউ, চিন্তে এখন কাজল পর।

২৪

উড়নিতে মোর, প্রাণেশ্বর গো, দাগ লেগেছে।
পঞ্চতত্ত্ব উড়নি আমার,   তায় ষোলোশোয় বাঁধনা দেছে।
বাপের ঘরের উড়নি আমার শ্বশুরঘরে এসে
মনের সঙ্গে গোল্লায় গেল শেষে।
রগড়ে ধুলাম, দাগ না গেল,
জ্ঞান-সাবান যে আনল প্রাণেশ্বর।
দাগ যাবে তোর, কবীর বলছে, সাঁই যখন আর
রাখবে না তোকে পর।

২৫

ফাল্গুন মাস অসে।   প্রাণেশ্বরের পাশে
নির্ভিন্ন করবে কে?
প্রাণেশ্বরের শ্রী   তার কেমন ভাষ্য দি!
ওই রূপেই সত্তা যে।
ওই রঙ্গে রঙ্গিণী,   পান করলাম নিছনি,
তনুমন ভুলে যাই।
ভাবছ, এই যে হোলি,   এ নেহাত মামুলি,
নয় সে বাচ্য, ভাই।
অল্প লোক তো জানে   গতির আসল মানে,
কবীর বলছে তাই।

২৬

আমার মন যে কাঁদে বাপের নগরে।
বাপের নগর বিগড়ল যার, ঘরদোরে তার কী হবে রে!
এই দেহমন হয় উচাটন, মন লাগে না রে!
আমার মন লাগে না রে!
লাখ দরোজা এই নগরে, মাঝখানে ঘাট সমুদ্দুরের,
বল সখী বল, কমনে এখন পার হব সই এই সুদূরে!
বাপের বাড়ি বানিয়েছিল আজব তানপুরা—
ওই তারে মন ঝনকে ওঠে রে।
তার ভাঙল খুঁটি, তারগুলো সব ছিঁড়ল যখন
কেউ কিছু আর বলল না তো রে।
আমি হাস্য করে বাপ-মাকে মোর জিগেস করেছি
কাল ভোরে কি শ্বশুর-নগরে...?
তাঁর যা ইচ্ছা তাই তো হবে, শরম ভরম ওই হাতে রে।
আমি সিনান করে কনের মনে রয়েছি যে তার পথের পানে
ঘোমটা খুলে দেখতে দে না, মিলনরাত্তি আজ এখানে।
কবীর বলছে, কাল ভোরে তুই ওই কথাটাই করবি মনে,
বান্দা রে তুই করবি মনে। ঘুম আসে না আজ শয়নে।



২৭

সজনী লো, আমি আজ প্রিয়-অভিলাষী।
যৌবন এল আর বিরহের সন্তাপ'
জ্ঞান-গলি দিয়ে যাই আমি গরবিনী।
জ্ঞান-গলিতেই তাঁর চিঠিখানি পেয়ে যাই—
সংবাদ পাঠালেন তিনি।
চিঠিতেই লেখা আছে অগম্য বার্তা যে,
মরণের ভয়টিকে আর কি গো চিনি'
কবীরের কথা শোন, ওরে ভাই সজ্জন,
বর দিয়েছেন আজ অবিনাশী যিনি।

২৮

না পারি গো তোমার কাছে আসতে এবং
তোমায় ডেকে আনতে,
এমনি করে প্রাণটা নেবে বিরহদহনান্তে!
এই দেহ তো পুড়িয়ে যাব—
স্বর্গে যাবে ধোঁয়া,
এই দহনে জল দিয়ে সেই রাম না করুক দোয়া।
জ্বালব দেহ, করব কালি, লিখব রামের নাম;
করঙ্ক সে কলম হবে,
লিখব এবং লিখব এবং পাঠাব তাঁর ধাম।
প্রদীপ করে এই দেহকে, সলতে দেব প্রাণ।
দেখব কখন তাঁর মুখানি সেই আলোকের সিঞ্চনে অম্লান!
মুক্তি না দাও বিরহিণীর,
দেখাও তোমার রূপ;
অষ্টপ্রহর দহন যে আর সইতে পারি না।

২৯

নয়ন-অন্তরে এলে গো তুমি আজ
বন্ধ করে ফেলি দু-নয়ন,
না হোক দেখা আর কাউকে, তোমাকেও
দেখতে দেব না গো দেব না।
কবীর বলে তাই যেখানে সিঁদুরের
রেখাটি দিতে হয়, কাজল তাতে নয়;
যে চোখে রাম হন, সেখানে অন্যের
কোথায় কীভাবে গো আসন হয়।
প্রতীতি মনে নেই, নেই তো প্রেমরস,
শরীরে নেই তত ভঙ্গি;
কী জানি কীভাবে যে খেলার প্রতিভায়
প্রিয়ের হব আমি সঙ্গী।

৩০

প্রিয় জেগে আছে আর কী করে ঘুমাই রে!
পাঁচ সখী হল শুধু সঙ্গের সাথী রে।
ওই রঙ্গেই আমি রঙ্গিণী হয়েছি
প্রিয়-রঙ্গের আমি কিচ্ছুটি পাই নি।
জাঁদরেল শাশুড়ী ও ননদিনী রয়েছে
আর আছে দেওরানী, ভয়ে বুক কাঁপছে—
ভয়ে ভয়ে থেকে প্রিয়-মর্ম যে পাই নি।
দ্বাদশের পরে ওলো শয়ন তো রয়েছে—
তার ওপর আমি আর উঠতে যে পারি নি,
ওই লজ্জায় বড় লজ্জায় মরি যে!
দিন-রাত বুকে শুধু বেদনায় মরছি,
তার কথা শুনি নি তো, কই তাকে জানলাম!
প্রিয়-সঙ্গের সুখ আমি আর কী জানি!
কবীরের কথা এই, ওলো সখী সেয়ানী,
সদ্‌গুরু বিনা প্রিয়-সঙ্গটি হয় না।

৩১

নয়নে কুঠরি করি, মণি হল পালঙ্ক তাই
পলকের চিকটা ফেলি প্রিয় দিলদারও হল
প্রিয়কে পত্র লিখে পাঠাতাম বিদেশ হলে
তনু-মনে এই নয়নে রয়েছে সে, আর কী বলে
তাকে সব বার্তা পাঠাই!

৩২

এই কথাটা দেখাদেখির, হয় না সে তো লিখে।
বর-কনেতে মিলালে, তখন বরযাত্রির ফিকে।
কাগজ লেগে কাগজী, আর সেও তো বিষয়ী—
আত্মদৃষ্টি লিখবে কীসে! সব যে প্রণয়ীর।

৩৩

দয়িত আমার, অবিনাশী; হে ভক্ত-পাবন, আর কবে দেখা পাব?
জলে জন্ম জলে বাস, তবু কেন মেটে না পিপাসা?
পথ চায় বিরহিণী, তোমার মিলন হবে—এই তার আশা।
ঘর ছেড়ে বের হলাম তোমারই জন্য আমি, ও চরণে হয়ে আছি লীন।
ব্যাকুল হয়েছি ঘরে, আমি আজ; যেমন গো জল বিনে মীন।
দিনে তো অরুচি, রাতে ঘুম নেই, ঘর-দোর উচাটনে যায়—
শয্যা বৈরী হল যে আমার, জেগে জেগে রাত কাটে হায়!
তুমি যে আমার স্বামী, ও স্বজন, দাসী এক তোমারই তো আমি,
হে দীনদয়াল ওগো স্রষ্টা তুমি, প্রবল, এখন তবে দয়া করো স্বামী।
দয়িত, এ প্রাণ আমি এখন ছাড়ব যদি তুমি না আপন করে নাও।
তাই এ কবীরদাস প্রবল বিরহে বলে, প্রভু হে, আমায় দেখা দাও!

৩৪

ননদিনী খান্ডারনী— কুমতির ডাণ্ডা হাতে
উঁচিয়ে রয় নিশিদিন,
সুমতি ভাল্লাগে না।
নিশিদিন বঁধুর নামে রহি রহি রঙ্গ লাগে
সখীদের সঙ্গ করে হেসে খেলে কাল কাটালাম,
তাই বড় ভয় লেগেছে।
বঁধুর উঁচু অট্টালিকা— ওইখানে উঠতে গেলে
প্রাণে মোর কম্প লাগে।
তবু সুখ চাইলে, শরম ছাড়াটাই কাজের কথা,
প্রিয় কিছু নিবিড় হবে।
গুণ্ঠন উন্মোচনে অঙ্গের সমর্পণে
নয়নের নির্মঞ্জন।
কবীরের হক কথা শোন ওরে ভাই তুই সজ্জন,
যে চতুর সেই তো জানে—
যার দয়িতের আশা নেই সেই করে পণ্ডশ্রম
নির্মাণে তার অঞ্জন।

৩৫

বঁধুয়া জাগাল ওরে, যখন ছিলাম আমি ঘুমে অচেতন।
এ দীনা পরেছে তাঁর চরণ-কমলে রাখা নয়ন-অঞ্জন।
ঘুমের জড়িমা আর দেহের অলস যাক
বঁধুয়ার কথা প্রেম-সাগর সমান।
ওইখানে আমি আজ করে নেব স্নান।
জনম জনম ধরে কী পাপ জমেছে ওরে
সবই তার ধুয়ে দেবে আমার সিনান।
শরীর-প্রতিমা যবে জগৎ-প্রদীপ হবে
রবে তায় একখানি প্রীতির পিঞ্জল—
পঞ্চতত্ত্ব তেলে ব্রহ্ম-অগ্নি জ্বেলে
দীপখানি হবে ওবে অতীব মঞ্জুল।
বঁধুয়া আমার নিজে প্রেমসুরা দিয়ে তার, নিজেও আকণ্ঠ পানে মত্ত মহারাজ।
বিরহ-আগুনে দেহ জ্বলে-পুড়ে খাক হল, ভালো তো লাগে না কোনো কাজ।
উঁচু অট্টালিকা-পরে আমি তো উঠেছি ওরে
কাল যে এখানে গতিহীন।
কবীর বলে বে তাই বিচাব করেছি ভাই,
মরণ আমায় দেখে ভযে হল ক্ষীণ।

৩৬

আমার স্বামী বসত করে অগম পুরীতে,
আমি ওইখানে যাই, যাই রে।
আট কুঁয়া আর নয়টা পুকুর, জল আনে তায় ষোড়শ নারী,
ছলকাল এক জলভরা ঘট, মরমরা তাই রয় দুলারী।
চন্দনের এক ছোটকা ডুলি,
ছোট্‌কা চাট্টি বাহক আছে তার;
রাখল আমায় সেই দেশে রে,
ওইখানে কেউ স্বজন নেই আমার।
আমার প্রভুর মহল উঁচু,
বিষম বাজার সঙ্গে যে রয় তার;
পুণ্য-পাপের দুই বেনে রয়, মুক্তা-হীরক গুনবে সাধ্য কার!
কবীর বলছে, শোন বঁধুয়া, এইটি আমার দেশ;
যেইজনা যায়, আর ফেরে না, বলব কী সন্দেশ!

৩৭

কোটি ভানু আর শশি তারা সব ছুয়োছুয়াটি পায়।
মনে মন আর নয়নে নয়ন, নয়নে ও মনে এক হয়ে যায়।
সুরত-সোহাগী, বঁধুর মিলনে অঙ্গের আঁখি বোজ—
কবীর বলে রে, পূর্ণপ্রেমের মিলনে পাবি সে সুরত-রসের খোঁজ।

৩৮

গাও কুলবতী মঙ্গলাচার।
ঘরে এল রাজা রাম ভাতার।
তনুরাগে মন অনুরাগী হলে বরযাত্রী এ পঞ্চতরিকা—
যৌবনমদেমত্তা আমি গো, রামদেব মেহমান আমার।
শরীর-সায়রে করব বেদিকা, ব্রহ্মা কইবে বেদ-বচন,
রামের সঙ্গে সপ্তপদী গো, ধনি্য ধনি্য বরাত আমার।
তেত্রিশ কোটি দেবতা এল রে, এল রে আঠাশ হাজার মুনিও,
কবীর বলছে, চললাম আমি, অবিনাশীজন খসম আমার।

৩৯

আমার বঁধুয়া রংরেজ, তাই রাঙালো আমার চুনি।
রাগারুণ হল তারই ছোঁয়া পেয়ে শ্যামবর্ণের উড়নি।
এ-রং ধুলেও যায় না সহজে, দিনে দিনে আরো মঞ্জুল—
দুঃখ-আছাড়ে কলুষ ধুয়ে সে রাঙালো চুনি কী বিপুল!
ভাবকুণ্ডের স্নেহজলে তার প্রেমবর্ণের মন্থন।
চতুর বঁধুয়া রাঙালো যে তাই, সে পরম জ্ঞানী সজ্জন।
বঁধুয়ায় দেব সবই যা আমার—তনু-মন-প্রাণ-ধন।
কবীর বলছে, রংরেজ তুমি দয়াল, তাই তো নিয়েছি তোমার নাম।
শীতল চুনি জড়িয়ে আমিও হয়েছি পূর্ণকাম।

৪০

পাহাড়ে পাহাড়ে কেঁদে ফিরি আমি, নয়ন যে খোয়া যায়।
সে-জড়ি পাই নি, যাতে এ-জীবন অন্তত বাঁচে, হায়!
এ নয়ন জ্বলে, ক্ষণে ক্ষণে আমি তোমাকেই শুধু চাই;
তোমায় পাই নি, আনন্দ নেই, বেদনা আমার তাই।
সুখে আছে সব সংসার, সব খায়দায় শুতে যায়;
দুঃখী এ দাস কবীর জাগে যে নিরন্ত কান্নায়।

৪১

রূপ-রেখা নেই যার অধরা সে, হয় নি যে দেহী।
গগন-মণ্ডল-মাঝে রয় সেই পুরুষ বিদেহী।
ও সাঁই আমার ওগো, তুমি ভিন্ন আর কেউ নয়।
যে বলে সাহেব দুটি, সে মানুষ অনাকুলে রয়।
সগুণের সেবা করো, করো লাভ নির্গুণের জ্ঞান।
নির্গুণ-সগুণাতীত যেইজন, সে আমার ধ্যান।

৪২

সেইজনা, সাধু, উভবোয় নদী,
মন ছাড়ে তার অহং যদি।
কেউ বলে মুই জ্ঞানী রে ভাই,
কেউ বলে মুই ত্যাগী,
কেউ বলে মুই ইন্দ্রিয়জিৎ,
অহং সবার লাগি।
কেউ বলে মুই যোগী রে ভাই,
কেউ বলে মুই ভোগী,
অহং আমার দূর হল না,
কেমন বাঁচব রোগী।
কেউ বলে মুই দাতা রে ভাই,
কেউ বলে মুই তাপস,
আপন নামে নিশ্চিতও নয়,
মায়ায় সবার আপোস।
কেউ বলে মুই যুক্তি জানি,
কেউ বলে মুই বাঁচতে,
আত্মদেবে চিনল না কেউ,
সব ঝুটা সব মিথ্যে।
কেউ বলে সব ধর্ম সাধা,
কেউ বলে সব ব্রত,
অহং-গেরো ছিঁড়তে নারে,
কবজ মাথায় কত।
গবব-গুমর সব ছুঁড়ে
কিছু করার শক্তি নাই,
কবীব ভণয়, প্রভুর চাকর
শ্রীপদে পায় ঠাঁই।

৪৩

পুঁথি পড়ে পড়ে জগৎ মরল, পণ্ডিত কেউ নয়,
প্রিয়ব একটি আখর যে পড়ে, পণ্ডিত সেই হয়।

৪৪

অগম অগোচর গম্য নন যিনি, দীপ্তি পায় তাঁহে জ্যোতি।
কবীর বলে, পাপ-পুণ্য হয় না তো রাখে হে যেই জন নতি।

৪৫

বুঝেসুঝে পাঁড়ে তুই জল খাবি রে!
যে মাটির ঘরে বসে, জেনে রাখ স্রষ্টা সে—
ছাপ্পান কোটি কত যাদব মেশে,
আর কত মুনি রে, অষ্টাশি হাজারে
এই মাটি নিল তার সব অবশেষে।
পদে পদে হল গোর কত পয়গম্বর,
মিশে গিয়ে সবই তার হল মাটি বারবার।
তবে শোন তুই পাঁড়ে, আজ সেই মাটিভাঁড়ে
বুঝেসুঝে ওরে তুই জল খাবি রে!
কচ্ছপ জলে আছে, ঘড়িয়াল আর মাছে
বিয়োল রে কত সব—শোণিতের ধারা
ওই জলে মিশে যায়—পশু, নরে নষ্টায়,
নদীজল হল তাই নরকের বাড়া।
হাড়-মাস থেকে যে দুগ্ধটা ঝরেছে—
কোত্থেকে এল দুধ, তুই বল, পাঁড়ে?
দুধটা যে খাচ্ছিস, কোত্থেকে পাচ্ছিস
শুচিবাই কেন তোর মাটির এই ভাঁড়ে?
বেদ-কোরানেরে ছাড়, এসবে কী হবে আর!
কবীরের কথা শোন, তোর মনে বিভ্রম—
পাঁড়ে তোর বিভ্রম, এই তোর কর্ম!

৪৬

শোন রে সাধু, পাঁড়ে নিপুণ কসাই।
ছাগলী মেরে ভেড়ীর পিছে ছুটল ও যে
দিল-দরদে নাই।
চান করে ও তিলক কেটে বসল দেবীপুজোর পাটে,
আত্মা মেরে এক পলকে রক্তনদী বহায়।
পুণ্য অতি, উচ্চকুলে জন্ম রে তার—
সভার মাঝে সেই অধিকার চায়।
দীক্ষাটি চায় এর কাছে সব,
শুনেও হাসি পায়।
পাপখালনের কথা শোনায়,

কিন্তু নিজের কর্মে ও যে নীচ;
দেখছি ওরা পরস্পরে ডোবায়,
ওদের যম দিয়েছে খিচ।
গাই মারে যে, তুরুক তো সে,
কম কীসে ও, বল!
কবীর বলে শোনরে সাধু,
কলির বাউন ধূর্ত, অতি খল।

৪৭

অবধূত ওরে, কুদরতির কী লীলা, মরি!
দীন হল তাঁর কৃপায় রাজা, সম্রাট হল দীনভিখারি।
লবঙ্গ-ফল হয় না তাই তো, হয় না রে ভাই চন্দন-ফুল,
মীনশিকারি তো জঙ্গলে, আর সিংহ ঘুরল সাগরকূল।
এরণ্ড গাছ করল রে এক মলয়গিরি, চারদিকে ওড়ে তার সুবাস।
তিন লোক ব্রহ্মাণ্ড রইল খণ্ডমাঝে, অন্ধর চোখে এই পরিহাস।
পঙ্গু পেরোয় সুমের পাহাড়, তিন ভুবন সে ঘুরল রে,
বোবায় প্রকাশ জ্ঞান-বিজ্ঞান, শুদ্ধবাণী সে বলল রে।
আকাশ বেঁধে সে পাতালে পাঠায়, শেষনাগ করে স্বর্গবাস।
কবীর বলছে, রাম যা করেন, তাইতে মানায় রাজার কাজ।

৪৮

ভেবে দ্যাখ তুই ওরে অভিমানী একবার,
চাদরটা পুরোনো যে, সংসারে ছারখার।
জোড়াতালি দিয়ে তুই অঙ্গে তো জড়ালি—
পাপে আর লোভে মোহে ময়লা যে করালি।
জ্ঞান-সাজি দিয়ে তুই ভালো করে ধুলি না,
এই পরে গেল তোর জীবনের বহুদিন।
ভালো আর মন্দের তুই কিছু দেখলি?
শঙ্কা যে এত ওরে জানপ্রাণ ভাবলি—
মানসম্মান সব এটাতেই রাখলি।
কিন্তু এ জিনিশটি অন্যের, ভেবেছিস?
কবীর তো বলছে রে, মমতায় রেখে দিস—
একবার হারালে ও, আর ফিরে পাবি না।

৪৯

খুঁজতে খুঁজতে কবীর, সজনী, হারালো রে আপনায়।
বিন্দু মিশেছে সিন্ধুতে, তাকে কত আর খোঁজা যায়!
খুঁজতে খুঁজতে কবীর, সজনী, হারালো যে আপনায়।
সিন্ধু মিশেছে বিন্দুতে, তাকে কত আর খোঁজা যায়!



৫০

আসা নেই, কোনো যাওয়া নেই, কোনো মরা নেই, কোনো বাঁচা নেই।
রহি রহি আমি আনন্দে শুধু গুরুকথা শুনে, আছে এই।
নিজেই কটোরা, নিজে থালা আমি,
নিজেই পুরুষ, নিজেই যে নারী,
নিজে সদাফল, নিজেই নিম্বু,
নিজে ইসলামি, নিজেই হিন্দু,
নিজে মাছ আর কচ্ছপ নিজে জাল,
নিজেই ধীবর, নিজে হই আমি কাল;
কবীর বলে রে, নাই আমি, আমি নাই—
জীবিতে ও মৃতে কোনোখানে আমি নাই।

৫১

অবধূত ওরে, মত্ত হয়েছে মন।
সমাধির মাঝে গগনরসটি খেয়ে, উজ্জ্বল হল এই ত্রিভুবন।
জ্ঞানকে সে গুড়, ধ্যানকে মহুয়া, সংসার ভাটি করে
সুষুম্না-নারী সহজের মাঝে খাচ্ছে এবং খাওয়াচ্ছে সেও, ওরে!
দুই পাত্রের মুখ জুড়ে দিয়ে কাম-ক্রোধ দুটি পলতে হয়েছে তায়,
মহারস তাই চুঁয়োচ্ছে আর সংসার-পাশ বিমুক্ত হয়ে যায়।
শূন্যমহলে মাদল বাজছে, আমার এ-মন নৃত্য করছে তাই—
গুরুপ্রসাদে যে অমৃতফলটি সহজেই আমি সুষুম্না থেকে পাই।
পূর্ণমিলন হলে সুখ হয়, তপের তাপন যায়।
কবীর বলছে, ভববন্ধন ছিড়লেই জ্যোতি, জ্যোতির স্পর্শ পায়।

৫২

পান করে নে মাতাল ওরে,
নামের অমর রস খা না রে।
বাল্যে ছিলি হেলায় খেলায়,
তরুণ হয়ে নারীর হলি,
বৃদ্ধ হলি কফে মজলি,
নড়তে নারিস খাটবিছানায়।
নাভিকমল রইল পড়ে,
কস্তুরী রয় তার ভিতরে,
বনের মাঝে ঘুরল হরিণ;
দুঃখ পেলি সদগুরুবিন—
দেহের বৈদ মিলল না রে।
বাপ-মায়ে আর সখা পুত্তুর
সঙ্গে ও তোর কেউ যাবে না

ধনযৌবন দিন দশেকের,
বাঁচবি যদিন গুরুই নে না।
চৌরাশিতে উদ্ধার চাস,
ছাড় কামনার বেদন রে;
কবীর বলে, শোন সজ্জন,
ভরল বিষে চুল-নখরে।

৫৩

চতুরালি দিয়ে পাবি না চতুর্ভুজে,
মন যদি তোর মাধবে না থাকে বুঝে।
জপতপ-ব্রত-পূজোয় কী তুই পাস,
হৃদয়ে দু-মুখো ভাব রেখে যদি যাস।
ছেড়ে দে না তুই লোভ আর লোকাচার,
ছেড়ে দে না ভাই কাম-ক্রোধ-হংকার।
কর্ম করতে অহম্-এ বদ্ধ হলি,
পাথর পেয়ে যে তার সেবা করে গেলি।
কবীর বলে তো সহজ সাধো রে ভাই,
ভাবের মানুষ পায় ভবে রঘুরাই।

৫৪

ন্যাংটো কী আর বাঁধবি চাম!
চিনলি না তোর আত্মারাম।
ন্যাংটো হলেই যোগ যদি হয়,
বনের হরিণ মুক্ত কই!
মুণ্ডু মুড়োলে সিদ্ধি হয় তো
স্বর্গতি ভেড়া পাচ্ছে কই!
বিন্দুটা তোর রাখবি ধরে—
তাইতে কি ভাই তরবি ওরে?
হিজড়েও কেন পরমগতি পায় না!
কবীর বলছে, শোন, তবে শোন,
রামনাম বিনে সিদ্ধি কারোর হয় না।

৫৫

মন, মিছে তুই হল্লা মচাস।
চান করে আর ছুঁস না কাউকে, ফুল বেলপাতা তুই চড়াস।
মূর্তি বানায় নিজের হাতে—জগজ্জন যে ফলটা চায়,
মন্দিরে কত পুজো করে সব, ব্রত করে কত তীর্থে যায়।
চলাতে-ফিরতে পায়ে ব্যথা করে, কোনখানে রাখি দুঃখটায়!

ঝুট কায়া এই ঝুট মায়া সব ঝুটমুটে মিলে ঝুট হয়ে যায়।
গাই বাঁজা হলে দুগ্ধ না দেয়, কোনখানে লোকে মাখন পায়?
সত্য যে থাকে সৎসঙ্গে, মার পড়লেই মিথ্যা যায়।
সাচ্চা বস্তু যেইখানে রয়, কবীর বলছে তাই—
সহজেই তাঁর দর্শন মেলে ভাই।

৫৬

গুপ্ত প্রকট হয়ে একই সব চিহ্ন,
বল কীসে ব্রাহ্মণ, শূদ্রটা ভিন্ন।
মিথ্যে গর্বে ভুলে পাস না রে শান্তি,
হিন্দু তুরুক ভুয়ো বুদ্ধির ভ্রান্তি।

৫৭

বেদ-কেতাব তো মিথ্যে রে ভাই, মনের চিন্তা কই যায়?
দমটুকু যার স্থির হল রে, হুজুর খোদায় সেই পায়।
বান্দা রে খোঁজ মনটাকে তোর,
রোজ রোজ বৃথা হয়রানি কেন আর—
এই দুনিয়াটা শহর, মেলা; নয়দুয়ারিটা ছাড়।
ঝুট পড়ে-পড়ে খুশ হয় সব—বাজে বকবক করে,
সাচ্চায় যার হক আছে সেই জগৎকর্তা মূর্তিতে নাই, ওরে!
আসমানে এক সাগর ভাসছে, গোসল কর না ভাই,
চর্মচক্ষে চেয়ে দ্যাখ তুই, সবখানে পাবি তাই।
পাক আল্লায় সবকিছু পাক। অন্য থাকলে, শঙ্কা করবি মনে।
কবীর বলছে, করিম-কর্ম করবে যেজন, জানবেও সেইজনে।

৫৮

ওরে, এই দুজনা রাস্তা পেল না।
হিন্দু করে নিজের বড়াই, কলসি ছুঁতে মানা;
বেশ্যার পায়ে রইল পড়ে, দেখ রে হিন্দুয়ানা।
মুসলমানের আউলিয়া পীর মুরগি মোরগ খায়,
মাসতুতো বোন বিয়ে করে, ঘরেই ঘটক পায়।
বাইরে থেকে মুর্দা এনে সাফসুতরে সেবায় চড়ায় ভাই;
সবজনা হয়ে এক সজনা গুষ্টিসুদ্ধু করল রে বড়াই।
হিন্দু করে হিন্দুয়ানি, তুর্কি তুরুকয়ানা,
বলছে কবীর, কোনখানে যাই বল তুই সজ্জনা!

৫৯

কোত্থেকে এল দুই ঈশ্বর, ঘোরায় কে সে মায়ায়?
আল্লা রাম আর করিম কৃষ্ণ হজরত এক ছায়ায়।
গয়না হল এক সোনাতে, ভাব দুটা নেই তায়;
কথায়শোনায় কুলুপ দে তোর
ও পাপী, সব সমান জানিস নমাজ ও পূজায়।
সেইজন্য হয় মহেশ্বর, মহম্মদও সে-ই; ব্রহ্মা আদম কয়।
কেউ বা হিঁদু, তুরুক বা কেউ, এক জমিতে রয়।
মৌলানা হয় কোরান পড়ে, বেদ পড়ে কেউ পাঁড়ে।
ভিন্ন নামে ডাকল রে সব একমাটির এই ভাঁড়ে।
কবীর বলছে, ভুল দুজনা; কেউ তো ওদের রামকে নাহি পায়।
কেউ খাসি কেউ গরু কাটে, বৃথাই জন্ম যায়।

৬০

না জানি তোর দয়াল কীরকম!
মোল্লা হয়ে আজান দিলি,
দয়াল কি তোর কালা?
কীটের পায়ে নূপুর বাজে—
দয়াল শোনে তাই।
লম্বা জটা রাখলি রে তুই,
তিলক কেটে ফেরাস কত মালা।
অবিশ্বাসের চাকুটা তোর অন্তরে যে,
এর মাঝে তুই দয়াল পাবি ভাই।

৬১

সাধু, পাগল হয়েছে জগৎখানা রে আজ।
সত্য বললে মারতে আসছে, মিথ্যায় সব কাজ!
হিন্দু বলছে রাম আমার তো মুসল্লি রহমান,
নিজের ভেতর লড়ছে দুটোয় মর্মটা অজ্ঞান।
দেখেছি নিয়ম ধর্ম এবং প্রাতঃস্নান যে করে,
আত্মা ছেড়ে সে পাথরপুজোয় নষ্ট জ্ঞানকে ধরে।
আসন করছে—হামবড়া ভাব, বহুত অহংকার,
গাছ-পাথরের পুজো করে আর তীর্থে ও ব্রতে মনকে ভোলায় তার।
মালা পরে আর টুপি পরে আর ছাপ লাগায় সে তিলক কাটে রে ভাই,
সাখী, শব্দই ভুলে যায় গানে, আত্মার খোঁজ নাই।
মায়া-অভিমানে মন্ত্র দেয় রে ঘরে ঘরে সব যায়,
গুরুর সঙ্গে শিষ্যরা ডোবে, অন্তকালে যে আফশোস করে হায়।
দেখেছি অনেক আউলিয়া পীর পড়েছে কেতাব-কোরান,
মুরিদ করল, কবরও দেওয়াল, খোদায় তো অজ্ঞান!

হিন্দুর দয়া, তুর্কির সব মেহর দেশান্তরে;
জীবহত্যায় দুজনেই আজ, আগুন লেগেছে ঘরে।
এই বিধি নিয়ে হাসছি চলছি, নিজেদের বলি সেয়ানা;
কবীর বলছে, শোন ভাই সাধু, এর মাঝে কে সে দেওয়ানা?

৬২

কাজি, তোর কেতাব নিয়ে কেমন বাখানি!
পড়তে পড়তে দিন যে গেল,
বললি না এই গতির কথা জানি।
শক্তি, স্নেহ ধরব আমি; ছুন্নতে মোর স্বীকার নাহি ভাই।
আমায় যদি তুরুক করেন খোদাই, তবে ছেদটা কেন নাই!
ছুন্নতে হয় তুরুক যদি, নারীর তবে কেমন বিচার হয়?
অর্ধাঙ্গিনী পায় না ছাড়া, হিন্দু হয়ে রয়।
হিন্দু তুরুক কোথেকে সব, চালান কে এই পথে;
হৃদয় খুঁজে দেখ রে তবে স্বর্গ-নরক আসছে কোথা হতে।
কেতাব ছেড়ে রাম ভজো রে,
পাগলা, ও তোর জুলুমটা যে ভারী!
কবীর ধরে রামের চরণ, তুরুক মানে হারই।

৬৩

পণ্ডিতে বল, কোথায় শুচি ঠাঁই।
বসলে যেথা ভোজন করে যাই।

মাও যে এঁটো, বাপও এঁটো,
এঁটো রে যেই ফলটা লাগে;
আসাও এঁটো, যাওয়াও এঁটো,
এঁটোই হলি তুই অভাগে।

আগুন এঁটো, পানিও এঁটো,
এঁটো রে যে রান্না করে;
হাতার এঁটো অন্নে লাগে,
খাদ্য খাদক এঁটোয় ধরে।

গোবর এঁটো, চৌকা এঁটো,
গণ্ডী দিলে সেটাও এঁটো হয়;
কবীর বলে, সেজন শুচি,
যেজন হরিভজন করে বিকার ছেড়ে রয়।

৬৪

আর নয়, এই বিজন বিভুঁই ছেড়ে আজ তবে চলি।
এই সংসার কাগজ-পুরিয়া, ধুলায় হবে সে ধূলি।
কাঁটায় কাঁটায় সংসার ছার, জড়িয়ে পড়লে মরণ, হায়!
আগুন লাগলে কাঁটাঝোপ এই সংসার হবে ছাই।
কবীর বলছে, ঠিকানা কেবল সদ্‌গুরু-নামে পাই।

৬৫

প্রেমের ঝুলা দোলা রে কেউ—
প্রেমরসে এই ভুজস্তম্ভে
তনু-মন আজ দোলা রে।
নয়নে বাদর ঝরুক আমার,   অন্তর ঘনঘটায় রে—
আয়, তোরা আয়, শুনিয়ে যা সব
বঁধুর ব্যাকুল কথায় রে।
কবীর বলছে, দাও সজ্জন   বঁধুর ধেয়ানে মনটারে।

৬৬

নাচো, হয়ে মত্ত ও মন;
বাজে প্রেমরাগ অনুক্ষণ,
করে সব শব্দ-শ্রবণ।
রাহু-কেতু নবগ্রহ,
জন্ম ও মৃত্যুও
নাচে আনন্দরসে।
ক্ষিতি গিরি সসাগরা
নাচে সব, বসুন্ধরা
নাচে কান্নায় উল্লসে।
ফোঁটা আর তিলক পরে
বসেছিস মাচায় ওরে,
হবি তুই সৃষ্টিছাড়া?
মন আমার হাজার কলায়
নাচে তাই, স্রষ্টা যা চায়—
এতে হন আত্মহারা।

৬৭

আকাঙ্ক্ষা যা তোর, ছাড়বি কী তায়?
প্রাপ্ত যা তোর, ছাড়লে ত্যাগী।
ক্ষিপ্ত ঘোড়ায় বাগ মানালে
সেইজন্য হয় আসল বাগী।

ভবের ভাবনা নয় রে শুধু,
তোর ভাবে তুই হোস রে ভাবী।
বন আর ঘরের ভাবনা ছাড়লে,
কবীর বলছে—সে বৈরাগী।

৬৮

বান্দা, ও তোর, বান্দামি কাম;
হরিবোল ছাড়া সব হারাম।
দূর যাবি তুই চিনতে নারিস,
এইখানে তোর নেই মোকাম।
নেই কোনো তোর বন্ধু হেথা,
নেই যে গাঁঠে একটি দাম,
চলবি রে তুই একার পথে—
মাঝখানে তোর নেই আরাম।
ভবের সাগর বিষমপাড়ি,
নাম নে রে তুই, বল শ্রীহরি।
কবীর বলে—থাকব সে থান,
রয় যেখানে রত্ননিধান।

৬৯

গুরু বিনে দাতা নেই, জগৎ ভিখারি।
ত্রিলোক ব্রহ্মাণ্ডে তিনি দয়িত সবারই।
অপরাধী তীর্থে যায়, তীর্থে কোথা ত্রাণ?
কাম-ক্রোধ-মলে দেহ ধুইবে কোনখান?
কাগজে বানানো নৌকা, মধ্যে ভারী লোহা—
শব্দভেদ না জানিলে সব যাবে খোয়া
মাঝ-দরিয়ায়, তাই কবীর যা বলে :
ভুল করে লোকে কোথা খুঁজে খুঁজে ফেরে।
সদগুরু আছে এই দেহের ভিতরে।

৭০

সদগুরু রয় লীলায় যেথা, সেথায় ঋতু বসন্ত।
পরম জ্যোতি সেইখানে যে, রয়েছে সাধুসন্ত।
তিন লোকে ভাই ভিন্ন রাজ বিরাজে,
বাজনা হলে সেইখানে তার শুদ্ধ ধুন বাজে।
চারদিকে সব বইছে জ্যোতির ধারা—
উতরোবে তায়, এমন সেজন বড়ই বিরলপারা।
কোটি কৃষ্ণের জোড় হল হাত

নামল যেথায় কোটি বিষ্ণুর শির
কোটি ব্রহ্মায় পড়ল পুরাণ
কোটি শম্ভুর রইল ধেয়ান
কোটি বাগ্‌দেবী গাইল যে কত রাগ
কোটি ইন্দ্র সে গগনলগ্ন থাক
সুর মুনি সব গন্ধর্বের সংখ্যাও গোনা দায়
সাহেব আমার যেথায় করেন প্রকাশ্য আপনায়।
বসন্ত রাগ যখন হল গীত
সদ্‌গুরুতে শব্দ উচ্চারিত।
কবীর বলছে অন্তর দিয়ে ভাই,
নরক থেকে উদ্ধারণে নাম এসেছে তাই।

৭১

গগন-মাঝারে যোগী ফিরে গেল, আর
সে আছে ওইখানে, পঞ্চ নারী ছেড়ে তার।
বিদেশী গিয়েছে, ওর কে দেবে সন্ধান!
গুহায় যে ফিরবে না ওই সিদ্ধিমান।
জ্বলে গেল কন্থা ওর, ধ্বজা গেল টুটি,
ভেঙে গেল দণ্ড আর খর্পরও তো ফুটি।
কবীর বলে রে, যোগী যোগসিদ্ধি পায়,
গগনে গিয়েছে, নেই আসা-যাওয়া তায়।

৭২

থাকব না আর মাটির ঘরে,
        হরির সঙ্গে থাকলে সুখ।
ঘর ভাঙা, তার বেড়া ঝরঝর,
        গর্জায় মেঘ, কাঁপছে রে বুক।
দশ দুয়ারে আগল তালা,
        দূর যাওয়া-আসা কী ঝকমারি!
কবীর বলছে, শোন রে এখন
        ভাঙেন যে, সংবারণ তাঁরই।

৭৩

দেহধারণের দণ্ড যে ভাই সকলে ভোগ করে—
জ্ঞানীর দণ্ড তার জ্ঞানে আর মূর্খ যে কেঁদে মরে।
ভাগ করে সব রইল, কিন্তু বেভাগ হয়েছে, হায়!
তীরগুলো সব শেষ হলে তাই কার্মুক ফেলে যায়।

৭৪

পাকে পাক দিলে জাঁতাকল, দেখে কবীরের চোখে জল।
পাটায় পড়লে সব্বাই ওরে ছাতু হয়ে যায়, ভাই।
ও বীর পথিক, অমন করে গো অঝোরে ফেলো না জল!
দিয়েছেন যিনি দুদিনের তরে, নিয়েছেন তিনি তাই।

৭৫

পাগল রে তুই জ্ঞান পেলি না বিচার করে!
জনম গেল বৃথাই ওরে!
চোখ থোকে যায়, শুনতে শুনতে কান থোকে যায় ভাই,
থোকল যে তোর শ্রীমন্ত ওই কায়া,
জন্মমরণ থোকল রে তোর, থোকল না সেই মায়া।
শ্বাস আছে ঘটে যদ্দিন, জীবে মায়ার তোয়াজ করে,
ভক্তি জন্মে, হরির চরণ-নিবাস-ভাবের জন্ম যে নেই ওরে!
যেজন জেনে অচিনজনে ভজনা করে যায়,
তার কিছু আর নেই রে সর্বনাশা।
কবীর বলছে, হার নেই তার—
বুঝদারি জন খেলতে পারলে পাশা।

৭৬

বেদ বলে নাকি সগুণ করছে নির্গুণে বিশ্রাম।
শোন রে সোহাগী, সগুণ ও তোর নির্গুণ ছেড়ে চক্ষুটা মেলে
দ্যাখ না নিজের ধাম।
ওইখানে তোর দুঃখ-সুখের কিচ্ছু কি পাবি আর!
কেবল সেথায় দর্শনই আট যাম।
ওড়না নূরের, শয়ন নূরের, রয়েছে রে তোর নূরের শিথান।
কবীর বলছে, শোন সজ্জন, সদ্‌গুরুজন নূর তামাম।

৭৭

এদেশ এমন, ফিরবে না কেউ আর!
যেইজনা যায় এদেশ, কেউ তো দেয় নি কোনোই খবর সেখানকার।
সুর-মুনি-নর পীর-আউলিয়া দেব-দেবী আর গণেশ
জন্ম জন্ম ঘুরল কতই ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ
যঙ্গম যোগী দিগম্বর আর সন্ন্যাসী দরবেশ
চুটকিধারী ও মুণ্ডিত কত পণ্ডিত পেল স্বর্গতি, নয় জাহান্নমের শেষ।
বিজ্ঞ গুণী ও চতুর কতই দীনভিখারি ও সম্রাট সব নরেশ—
কেউ বলে রাম, রহিম কেউবা, কেউ বলে শুধু 'আদেশ'।
ভেক ধরে সব ঘুরতে ঘুরতে খোঁজ করে সেই দেশ।
কবীর বলছে, শেষ নাহি পায়, শেষ নাহি বিনা সদ্‌গুরু-উপদেশ।



৭৮

সাধু, ধোকার কথা কাউকে বলা যায়!
গুণে নির্গুণ, নির্গুণে গুণ—এই বাট ছেড়ে বাইরে কি যায়।
অজর অমর সব লোকে কয়, অলখ সেজন ব্যাখ্যানে নাই—
স্বরূপ-বর্ণ কিছুই তো নাই,
সব ঘটে তবু রয়েছে রে সাঁই!
পিণ্ডের, ব্রহ্মাণ্ডের কথা বলল লোকে,
কোনখানে আদি অন্ত রে পাই!
পিণ্ড তো ছাড়, রইল যেজন ব্রহ্মাণ্ডকে ছাড়ি
সেই তো হরি, সেই তো হরি—
কবীর বলছে তাই।

৭৯

আজ কেমন করে তোমার দেখা পাই!
তোমার দেখা না পেলে যে মন মানে না সাঁই!
আমার সেবা আবিল, নাকি বুঝলে না গো, অবুঝজনা—
এই দুজনার মধ্যে বলো দোষের ভাগী কোন সেজনা!
তোমায় বলে রাজার রাজা, তিনভুবনের নাথ,
বাঞ্ছা তুমি পূর্ণ করো—
আমার হল হরিরসনা।
এখন তুমি আমায় ডাকো
না হয় নিজে তুমি এসো না!

৮০

গুরু অজর সিদ্ধিঘোটা খাইয়ে দিল ভাই।
গুরু আমায় সিদ্ধিঘোটা খাওয়ান যবে ভাই,
সেদিন থেকে মিটল আমার সকল দোটানাই।
নামৌষধি খেলুম আমি অধর-কটোরায়,
কুমতি মোর তৃপ্ত রসনায়।
ব্রহ্মা-বিষ্ণু পেল না তায়
শম্ভু খুঁজে জনম গোঁয়ায়,
নিরতি আর সুরতি করে যেজন এটি খায়,
কবীর বলে—সেইজনা তো অমর হয়ে যায়।

৮১

অগম অগোচর কেমন তিনি, তাই বলছি, বোঝো বাবা, এই—
যা দেখা যাচ্ছে হে, তেমন তিনি নন,
তিনি যা হন, তা তো বলার নেই।

কথা বা ইঙ্গিতে কীভাবে বলি বলো,
বোবার গুড় খাওয়া যেমন হয়;
চোখে না দেখা যায়, মুঠোয় আসে না সে,
অথচ তার থেকে দূরে সে নয়।
আমার গুরু এই এমন জ্ঞানকথা আমাকে কন;
বিচার করো তবে বিজ্ঞজন।

৮২

কী বলবি বলার আশে;
বলতে বলতে তত্ত্ব নাশে।
বলতে বলতে বিকার বাড়ে,
চুপ থাকা তবু কী বিচারে।
সত্ত্ব পেলে শুনবি বলবি;
অসত্ত্বে ভাই মৌনী ধরবি।
জ্ঞানীকে বললে উপকারী;
মূর্খকে বলা ঝকমারি।
আধ ফাঁকা ঘট কথায় বাড়ে;
ভরলে, কথা ঘটটি ছাড়ে।

৮৩

পণ্ডিতে হব বলছে ঝুটা।
রামনামে যদি লোকের গতি,
চিনি বললেই মুখটা মিঠা।
আগুন বললে পুড়েই যাবে,
জল বলে তখে তৃষ্ণা মিটা।
ভোজন বললে পেট ভরে, তবে
সবলোকে তো তারণ পাবে।
মানবসঙ্গে টিয়াও বলে—
হরিবোল, হরিপ্রভাব কোথা!
জঙ্গলে সে উড়াল দিলে
নামের প্রেমটা রইবে কোথা!
সত্যপ্রীতি বিষয়-মায়ায়,
হরিভক্তের সেই তো দাস;
কবীর বলছে, প্রেম না এলে
বন্ধনে যমপুরেই যাস।

৮৪

তুমি যে বলো ওহে নন্দনন্দন,
নন্দ হন তবে কাহার নন্দন?
আকাশ পৃথিবীও ছিল না যদি তবে,
কোথায় ছিল ওই তোমার নন্দ?
লক্ষ চৌরাশি যোনিতে ভ্রমণে সে নন্দ ভ্রমণে যে ক্লান্ত হন;
ভক্তিহেতু দেব হলেন অবতার,
ভাগ্য বড় তাই ভাবল অভাজন।
পড়ে না সংকটে জন্মমরণের, নামটি হল যাঁর নিরঞ্জন রে;
দাস এ কবীরের ঠাকুর এমনি যে
মা-বাপ কেউ তাঁর নেই রে নেই রে।

৮৫

পড়ো ভাষা সংস্কৃত, নিজেকেও ভাবলে জ্ঞানী।
আশাতৃষ্ণার প্রবহণ— সেখানেই করলে গাহন, হায় সজনী!
কামজ্বর সহ্য করো।
গাগরি মাথায় ধরো—
হুকুম আর তামিল তোমার, ওই গাগরি।
কেন তুই বইলি বোঝা? গাগরি ভাঙ না সোজা।
বঁধুয়ার পরশ নে না তুই এখনই—
কবীরের সাঁই যে বলে, ও সজনী!

৮৬

আমায় বৈরাগে আজ পেল।
জীব এসেছিল এইখানে, তবে কোথায় গেল?
আকাশে গগন পাতালে গগন দশদিক ওরে গগন ছায়,
আনন্দমূল পুরুষোত্তম সদা,
ঘটের বিনাশে গগন না যায়।
পঞ্চ তত্ত্ব মিলে কায়া হল,
তত্ত্ব কী করে এল বল?
কর্মবদ্ধ জীব বলো তুমি,
কিন্তু কর্ম সৃষ্টি কার?
হরির ভিতরে তনু আর এই তনুর ভিতরে আছে হরি—
নিরন্তর সে সকল-মাঝারে।
হরিনাম তুই ছাড়িস না ভাই, কবীর বলছে—
সহজে যা হল, হল রে।

৮৭

ঝনন ঝনন যন্ত্র-বাদন—
পাণিহীন আর চরণবিহীন নৃত্য।
বাদন হচ্ছে করতলহীন, শ্রবণ—সেও তো কর্ণবিহীন,
শ্রবণ আর শ্রোতা উভয়ে লুপ্ত।
পাট নেই, তবু সুবাস কিন্তু; সভা নেই, তবু হয় অবসর;
এই বোঝে সার মুনির চিত্ত।

৮৮

কাঁসের তরে ফিরব আপনি!
রামকে পাব, ছাড়লে পাঁচ তত্ত্ব রচনি।
মাটির গুণ শুষল পানি, পানি মিলল তেজে,
তেজ পবনে মিলল, পবন শব্দে মিলে সহজ সমাধি যে!
যেমন বহু সোনার অলংকার,
পরতে গেলে—একের ওপর এক মিলিয়ে সবটা একাকার।
অমন আমি ছাড়ব লোকবেদ,
শূন্যমাঝে ঢুকলে আমার ঘুচবে ভেদাভেদ।
জলের সব তরঙ্গ যে তরঙ্গিনী হয়,
অমন আমি দেখতে হব তায়।
আমার স্বামী সুখসাগর, কবীর বলে তাই,
হংস এসে হংসে মিলে যায়।

৮৯

তোমার উচু দালানকোঠা দেখব বলে, প্রিয়,
তাই চলেছি তোমার পানে, তোমারই ওই গৃহ
বড্ড উচু, হলুদরঙা কিনারটিতে তার
রয়েছে বাঁধা নাম-দড়ি এক, দুইটি বাতি আর—
চাঁদ-সুরুযের সমান তারা, মধ্যিখানে পথ,
পাঁচ পঁচিশ আর তিন মিলে সব তৈরি হল ঘর—
চৌধুরি মন রইল, প্রিয়; জ্ঞান-কোতোয়াল মুন্সিটিও,
চারদিকে তার হাটবাজারি দেখছি অতঃপর।
আটখানা ঘর, দশ দরোজা, নয়টি কপাট তারই—
গবাক্ষে তার রইল চেয়ে রূপসী এক নারী,
মাথার ওপর পেঁটরা ঝাঁপি দিব্যি আছে তার।
কবীর বলে, গুরু-চরণ যাই গো বলিহারি!
সন্ত সাধু সওদা করে, ভাই,
পস্তাল তাই আকাট হাঁদা মূর্খ আনাড়ি।

৯০

মন না রাঙিয়ে যোগী রাঙালি কাপড়!
আসনে বসলি ওরে মন্দিরে তোর—
ব্রহ্মকে ছেড়ে তুই ধরলি পাথর।
মন না রাঙিয়ে যোগী রাঙালি কাপড়!
কান ফুটো করেছিস, জটাজুট রেখেছিস,
দাড়ি রেখে যোগী তুই ছাগল যে হয়েছিস।
জঙ্গলে ধুনি জ্বেলে বসলি তো, বলি—
কাম নাশ করে শেষে হিজড়ে যে হলি।
মুণ্ডিত হলি যোগী, রাঙালি কাপড়,
গীতা পড়ে পেলি ওরে মিথ্যায় জোর!
কবীরের কথা ওরে শোন, সাধু শোন,
তোকে ধরে যমদ্বারে রাখবে এখন।

৯১

দে বাবা তুই আগুন এখন, জ্বালিয়ে দে ঘরখান।
ওই কারণেই ধন্দে পড়ে মন করে আনচান।
এক ডাইনি এখন বাস করে মোর ঘরের ভিতরে,
সে নিত্য আমার হৃদয় কাটে নিপুণ কামড়ে।
ডাইনির পাঁচ ছেলে নিশি- দিন তো নাচায় রে।
কবীর বলছে—হলাম আমি ওইজনাদের দাস;
ডাইনি সঙ্গে থেকেও আমার মন হল উদাস।

৯২

বোঝ তবে তুই বিজ্ঞ ওরে, বিচার করে দ্যাখ—
ও কি পুরুষ, না ও নারী।
বাউন ঘরে বামনী ও যে, যুগির ও যুগিনী,
কলমা পড়ে তুর্কিনী ও, কলিকালে একা
বর বরণও করল না ও, বিয়াও হল না,
পুত বিয়োল তবু, ও যে আদির আইবুড়ি,
নেড়ে, চুলো সকলে তার রইল পায়ে পড়ি।
বাপের ঘরে রয় না ও যে, শ্বশুরবাড়ি যায় না,
স্বামীর সঙ্গে শুচ্ছে মুখপড়ি,
কবীর বলে—জাতকুল খেয়ে
যুগযুগান্ত রইল যে সে আদির আইবুড়ি।

৯৩

জলে আগুন, পাত্রখানা খাক হল যে পুড়ে,
বিচার করে বিজ্ঞজনে দক্ষিণে উত্তরে।
গুরু আগুন লাগিয়ে দিল, জ্বলছে চেলা, আগুন বিরহের;
তুচ্ছ তৃণ রইল বেঁচে, পূর্ণে যে তার মিলন হল ঢের।
ব্যাধ লাগাল দাবদাহ, আর হরিণ কেঁদে মরে,
যেই বনে সে খেলত রে সেই বনকে আগুন ধরে।
জলেই প্রোজ্জ্বল সে আগুন, বহতা নদী রয়,
জল ছেড়ে মাছ রইল এখন, ভবের সাগর অগ্নিবুকে বয়।
আঙার হল নদনদী সব, ঘুমটা গেল ছুটে,
কবীর দেখে মাছগুলো তাই বৃক্ষ-পরে উঠে।

৯৪

ফকির আমার ভিখ মাগে রে,
একদিনও না দেখি তারে।
এমনি যে গো দীনভিখারি—
মাগন বিনা দেয় সে ছাড়ি,
তার কাছে কে টুকনি ধরে!
কবীর দিল সেইজনাকে
কাঙাল হয়ে আপনাকে—
হবার যা তা হোক না ভারী!

৯৫

সহজ সহজ সব লোকে কয়, কে সহজ চেনা দায়;
সহজে যেজন বিষয় ছেড়েছে, সহজ সে, বলা যায়।

সহজ সহজ সব লোকে কয়, কে সহজ চেনা দায়;
প্রসন্ন রাখে যেজন পঞ্চ, সহজ সে, বলা যায়।

সহজে সহজে সব চলে গেল—সুত-বিত-নারী-কাম;
এক হয়ে মিলে রয়েছে কবীর ভৃত্য, প্রভু তো রাম।

সহজ সহজ সব লোকে কয়, কে সহজ চেনা দায়;
সহজে যেজন হরিকে পেয়েছে, সহজ সে, বলা যায়।

৯৬

সাধু, সহজ সমাধি ভালো।
স্বামীর সঙ্গে মিলন যেদিন,
সুরতে সেদিন অন্ত থাকে না লো।
চোখ বুজে আর কান ঢেকে আমি দেহকে দিই না কষ্ট,
চোখ মেলে হেসে হেসে দেখি তার সুন্দর রূপ পষ্ট।
যা বলি, তা নাম; শুনি যা, স্মরণ; যা করি, ভজনা তাই;
গৃহ-উদ্যান একাকার দেখে দ্বৈতভাব মিটাই।
যেইখানে যাই, বিহরণ তাই; যা কিছু করি, তা সেবা;
শয়নে থাকলে, তা দণ্ডবৎ; পূজি না অন্য দেবা।
শব্দে আমার মন অবিরত, মলিন বচন ছাড়ি।
উঠতে বসতে ভুলি না সেজন, এমনই মিলন তাঁরি।
কবীর বলছে, উন্মনী হয়ে আমার সে-গান গাই।
সুখ-দুঃখের পরে এক সুখ পরম, সেখানে যাই।

৯৭

উলটে ঢোকে আপন-মাঝে। স্ফূর্ত জ্যোতি অনন্ত।
সাঁই-সেবকে এক হলে হয় প্রমোদঋতু বসন্ত।
যোগী সে হল, ঝলক পেল, মিটল উচাটন।
উলটে ঢুকে আপন-মাঝে ব্রহ্মসম হন।

৯৮

গগনে দামামা বাজল, নাকাড়া হানল ঘা।
ক্ষেত্র ডেকেছে শৌর্যশালী, তো লড়কে যা।
জগৎ পেয়েছে যে মরণে ভয়, সেই তো আমার আনন্দ।
কবে সে মৃত্যু হানবে আমাকে, দেখব পূর্ণ পরমানন্দ।

৯৯

সাধু, সহজে কায়া শোধা।
বটের ভেতর বীজটি যেমন, তাইতে পত্র-ফল-ফুল-ছায়া;
কায়ার ভেতর বীজ বিরাজে, বীজের মধ্যে রয়েছে কায়া।
অগ্নি-পবন-সলিল পৃথ্বী-নভ সেজন ছাড়া মিলবে কি ভাই!
পণ্ডিত, কাজি, করো নির্ণয় আপন-মাঝে তোমার কী নাই।
জলভরা ঘট জলেই থাকে, বাইরে ভেতর একটি সে,
নামটি যে তাঁর বলতে মানা, দ্বৈত হবেন সন্দেহে।
কবীর বলছে, শোন রে সাধু, সত্যশব্দ আমার সার।
আপন যে কয় আপন-মাঝে, আপন হল স্রষ্টা তার।



১০০

যা ছিল বলার, বলে দিয়েছি তা, এখন কিছুই নেই।
দুই গিয়ে এক হয়েছে, নদীও চলল সমুদ্রেই।
সমাধিতে মন লেগেছে আমার, পৌঁছে গেল সে শূন্যে—
চাঁদ নেই, তবু চাঁদিনী রয়েছে অলখ নিরঞ্জন রে।
গগন গরজে, অমৃত বরষে, বাদল গভীর ধারায়,
চারিদিক ঘিরে বিদ্যুৎ, ভেজে কবীর আত্মহারায়।

শব্দ-সংকেত

বর্ণানুক্রমিক প্রথম ছত্রের সূচি

শব্দ-সংকেত

পদ-সংখ্যা ২

জোলা— চঞ্চলপ্রবৃত্তি মানুষ। তানার ভিতর— শরীরের মধ্যে। আঙুল প্রমাণ মাপখানা— শরীরের ভেতর অঙ্গুষ্ঠমাত্র জীবকে পরিমাপের উপায় করো। নাটাই—সুতো গুটোবার চরকি। নাটাই বা লাটাই উচ্চারণভেদে উভয়ই প্রচলিত। রামনারায়ণ— রাম অর্থে চেতন, নারায়ণ অর্থে অচেতন। মাড়ি— সুতোয় মাঞ্জা দেবার মতো করে বিশেষভাবে তৈরি মাড়। চিটও বলা হয়। এখানে ত্রিগুণাত্মক শরীর। সুতো-প্রস্তুতির এক পর্বে যেভাবে পরিষ্কার করে নেওয়া হয় সেরকমই কায়া-শোধন বা 'ধৌতি' করা প্রয়োজনীয়। 'হঠযোগ-প্রদীপিকা'-য় বলা হচ্ছে—"ধৌতি, বস্তি, নেতি, ত্রাটক, নৌলিক ও কপালভাতি, এই ছয়টি কর্মকে ষটকর্ম বলা হয়। এই ষটকর্ম গোপনীয়, দেহশুদ্ধিকারক এবং নানাবিধ গুণজনক, (এইজন্য) যোগিশ্রেষ্ঠগণ ইহাদের আদর করিয়া থাকেন।" কিন্তু সিদ্ধপন্থীর পক্ষে ষটকর্ম অত্যাবশ্যক নয়। সিদ্ধগুরুর কৃপায় তাঁর দেহে যে স্বাভাবিক সহজকর্ম সাধিত হয়, তাতেই মেদ-শ্লেষ্মা এবং কামক্রোধ অর্থাৎ দৈহিক এবং মানসিক মল ক্রমশ দূর হয়। কৃত্রিম যোগপন্থীদের মধ্যে সকলের ক্ষেত্রেই যে তা প্রযোজ্য, এমনও নয়। প্রাণায়ামের মাধ্যমেই সাধারণত মলশুদ্ধি সম্ভব হতে পারে। চাঁদ-সুরুয— চাঁদ অর্থে ইড়া এবং সুরুয বা সূর্য অর্থে পিঙ্গলা নাড়ী। মাঝ-দীপ— মধ্যবর্তী দীপ। এখানে সুষুম্না। মাঝ-দীপে মাঞ্জা দেওয়ার অর্থ মন দ্বারা সুষুম্নার শোধন। তিন ভুবনের নাথ— মন। শ্যামগিটে বাঁধনা— সুতো পরিষ্কার করার সময় যদি কোনোভাবে ছিঁড়ে যায়, গিঁট দেওয়া প্রয়োজন তখন, আর সেই গিঁট শ্যাম নামেই হওয়া বাঞ্ছনীয়। ভরনা— অর্থাৎ পুরে ফেলা। মাকুর ভেতর নলিতে সুতো ভরা। কাপড় বোনার জন্য পোড়েনের সুতো মাকুর নলিতে জড়ানো থাকে। তিন খেয়া— সুতোর পরিমাপ। মূলে ছিল 'পাঈ করি জব ভরনা লীনহো, বৈ বাঁধে কো রামা।/ বৈ ভরা তিহূঁ লোকহি বাঁধে, কোই ন রহতা উবানা।' অর্থাৎ সুতো পরিষ্কার করে যখন হরিনামের সুতো ভরবে তখন রাম নামের দুটি অক্ষর তাতে বেঁধে নিও। তাঁতি যেমন তিন ফেরতায় সুতোর গাঁট বাঁধে, যাকে 'তিলোক' বলা হয় (হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী এখানে বঘেলখণ্ডের রাজা 'বীজক'-এর প্রসিদ্ধ টীকাকার শ্রী বিশ্বনাথসিংজী দেব বাহাদুর-কৃত পাখণ্ডখণ্ডিনী টীকার অবলম্বনে একথাই জানাচ্ছেন। এই টীকাই বঘেলখণ্ডী টীকা হিসেবেও পরিচিত।), সেইভাবেই তুমিও ত্রৈলোক্যকে বেঁধে নাও এই নামে, তাহলে আর কোনো বস্তুই উদ্বৃত্ত থাকবে না। উবান শব্দের অর্থ এখানে কাপড়ের যে সুতো বাইরে থেকে যায়। অনুবাদে মূলের এই ভাবটিকে অবলম্বন করেই তিন খেয়া করা হয়েছে এবং উবানের অর্থ ঝালর করা হয়েছে। তিন লোকে এক তাঁতশালা... এই তানা—ত্রিলোককে তাঁতশালা করে, সুতো অর্থাৎ শরীরকে আলাদা করে যদি পুরুষোত্তমকে সেখানে বসাতে চাও তো বসাও অর্থাৎ এই হরিনামরূপ কাপড়ের প্রতিটি সুতোকে এমনভাবে একত্রে বসাও যাতে আদিপুরুষময় হয়ে যায় এবং তুমি নিজের প্রকৃত রূপ উপলব্ধি করতে পারো। কবীর তাই বলছেন এইভাবেই কাপড় বুনে তিনি জ্যোতির্ময়ের ভেতর মিশে গেছেন।

৪ এবং ১৫

নিরঞ্জন— সাধারণ অর্থে নির্গুণ ব্রহ্ম, বিশেষ অর্থে শিব। নাথপন্থীদের নাথ যেমন। মধ্যযুগের অধ্যাত্ম সাহিত্য এই নিরঞ্জন শব্দটিতে আকীর্ণ বলা যায়। বাংলায় ধর্মমঙ্গলের ধর্ম নিরঞ্জন হিসেবেও পরিচিত হয়েছেন। বৌদ্ধসহজিয়াদের সংস্রবও এই শব্দে নিহিত। কবীরের পদে নিরঞ্জনের একাধিকবার উল্লেখ আছে। কবীরের রামই নিরঞ্জন; আবার এমনও দেখতে পাওয়া যায়—'গোব্যন্দে তূঁ নিরঞ্জন', অর্থাৎ 'গোবিন্দ, তুমিই নিরঞ্জন'।

দ্বিবেদীজী লিখেছেন—"নিরঞ্জনী সাধুদের এক সম্প্রদায়কে রাজপুতানায় পাওয়া যায়। কথিত আছে ওই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক স্বামী নিরানন্দ নিরঞ্জন ভগবানের (নির্গুণ) উপাসক ছিলেন। তবে আজকালকার নিরঞ্জন-মত অনুযায়ী অনেকেই রামানন্দী বৈরাগীদের মতোই রাম-সীতার উপাসনা করে, শালগ্রাম শিলা এবং গোমতী-চক্রকেও মান্য করে ('ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়', দ্বিতীয় ভাগ, পৃ ১৮৯)। শ্রীক্ষিতিমোহন সেন লিখেছেন আজ অবধিও উড়িষ্যায় নিরঞ্জন-পন্থ জীবিত রয়েছে, নির্গুণ সাধনার প্রভাব তাঁরা ছড়িয়েছিলেন। এখান থেকে পন্থের শিক্ষা মধ্যদেশ এবং পূর্ব প্রান্তেও পৌঁছেছিল। পশ্চিম ভারতেও এঁদের প্রভাব এখনো দেখতে পাওয়া যায় ('মেডিয়াভেল মিস্টিসিজম', পৃ ৭০৭)। হালের অনুসন্ধানে জানা গেছে বঙ্গের পশ্চিম দিকে তথা বিহারের পূর্বাংশে আজো এক ধর্মমত রয়েছে যার দেবতা নিরঞ্জন বা ধর্মরাজ। আমি আমার 'কবীরপন্থ' শীর্ষক নতুন বইখানিতে জানিয়েছি এক সময় এই ধর্মসম্প্রদায় ঝাড়খণ্ড, এবং রিওয়াঁ অবধি প্রচলিত ছিল। পরবর্তীকালে এঁদের সমস্ত পৌরাণিক আখ্যান কবীর মত-এ গৃহীত হয়েছে, কিন্তু তার অর্থ বদলে গেছে।" নিরঞ্জন শব্দের বিকৃতি কবীর পন্থীদের দ্বারাই হয়েছে। এঁরা মন অর্থেও নিরঞ্জন শব্দের ব্যবহার করেছেন। কিন্তু পরম্পরাগত দিক থেকে, কী কবীরের প্রাচীন বাণী, কোনো ক্ষেত্রেই নিরঞ্জনকে মন (বা ভগবানের অতিরিক্ত অন্য কোনো বস্তু) হিশেবে ভাবনার সমর্থন পাওয়া যায় না। নিরুপাধি নির্গুণ গোবিন্দকে যে কবীর 'নিরঞ্জন' সম্বোধন করেছেন তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। যাঁর কোনো রূপ নেই মুদ্রা নেই মায়া নেই সবকিছুর অতীত যিনি, কবীরের কাছে তিনিই 'নিরঞ্জন'। এই প্রসঙ্গে ৪১ এবং ৮১ সংখ্যক অনূদিত পদ দ্রষ্টব্য।

কবীর সংসারকে অঞ্জন বলেছেন। উৎপত্তি, পরিবর্তন, আগমন-নির্গমন, যোগ-ধ্যান-উপাসনা—সমস্ত কিছুই অঞ্জন, সমস্ত কিছুই কলুষিত। নিরঞ্জন বা অমল একাকী রামই সর্বঘটে বিরাজমান। কবীর পরিষ্কারই বলেছেন নিরঞ্জন এক এবং মন আরেক "কবীরপন্থের উৎসাহী চেলারা নিরঞ্জন শব্দটিকে সীমাবদ্ধ করেছেন যেভাবে, সম্প্রদায়ের কাছে সেই আধারেই নিরঞ্জনের অর্থ যে মন হয়ে দাঁড়াবে এতে কিছু অন্যায় নেই।" দ্বিবেদীজী একথাই বলেন এমত উদাহরণে—'না হজ জাউঁ না তীরথ পূজা।/ এক পিছাণ্যা তৌ কয়া দূজা।।/ কহৈ কবীর ভরম সব ভাগা।/ এক নিরঞ্জন সূঁ মন লাগা।।"

১০

নাদ ও বিন্দু— 'নাদ' বলতে সাধারণভাবে আমরা ধ্বনি বা শব্দ বুঝে থাকি। অধ্যাত্ম-জগতে এই ধ্বনি বা শব্দ বা নাদ-এর সম্পর্কে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। সৃষ্টির মূলে নাদ বা শব্দের মহিমা সর্বত্রই স্বীকৃত। গোপীনাথ কবিরাজ লিখছেন—"ভারতবর্ষের বৈদিক, তান্ত্রিক এবং অন্যান্য সাধনার চরম সিদ্ধান্ত ইহাই এবং অন্বেষণ করিলে জানিতে পারা যাইবে খ্রিস্টীয়, মোহাম্মদীয় প্রভৃতি অন্যান্য দেশের সাধনতত্ত্বেরও ইহাই সার কথা।" কৃষ্ণ-যজুর্বেদীয় 'তেজো-বিন্দূপনিষৎ' বলছেন— 'তেজোবিন্দুঃ পরং ধ্যানং, বিশ্বাতীতং হৃদি স্থিতম।/ আনবং শাম্ভবং শাক্তং স্থূলং, সূক্ষ্মং পরঞ্চ যৎ।।' অর্থাৎ, 'তেজ আর বিন্দু ধ্যানের পর বিশ্ব সংসারের অতীত তিনি হৃদয়ে আছেন। সকল ব্রহ্মের অণুতে স্থূল শিবলিঙ্গ জগন্ময় এবং সূক্ষ্মের সূক্ষ্ম, আর সকলের পর যিনি।' ('যোগিরাজ শ্যামাচরণ গ্রন্থাবলী', পঞ্চম খণ্ড)

গোপীনাথ কবিরাজ আরো বলছেন—"সৃষ্টির অতীত স্পন্দহীন যে মহাসত্তা স্বপ্রকাশভাবে নিত্য বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা একদিক হইতে দেখিলে যদিও স্পন্দের অতীত, তথাপি অন্যদিক হইতে দেখিতে গেলে তাহাকেও স্পন্দময় বলিয়াই গ্রহণ করিতে হয়। এই মূল স্পন্দই আত্মার স্বাতন্ত্র্যরূপ পরাশক্তি। স্বাতন্ত্র্য বা মহাশক্তি সর্বদাই আত্মার সহিত অভিন্নরূপ একরসভাবে বিদ্যমান থাকে। কিন্তু স্বাতন্ত্র্যের মাহাত্ম্যই এই যে উহা আত্মার সহিত নিত্য অভিন্নরূপে থাকিয়াও ভিন্নবৎ প্রতীত হইতে পারে, এক থাকিয়াও অনেকবৎ প্রকট হইতে পারে এবং নিষ্ক্রিয় থাকিয়াও অনন্ত ক্রিয়াবিলাসরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। এই যে মূল স্বাতন্ত্র্য, ইহাকে অদ্বৈত তান্ত্রিকগণ বিমর্শশক্তিরূপে বর্ণনা করিয়া থাকেন। যে পরমসত্তার সহিত উহা অভিন্ন তাহাকে তন্ত্রশাস্ত্রে প্রকাশ নামে অভিহিত করা হয়। প্রকাশ ও বিমর্শ দুইই এক, অথচ এক হওয়া সত্ত্বেও উভয়ে অনির্বচনীয় বৈলক্ষণ্য রহিয়াছে। কারণ, প্রকাশ বিমর্শহীন অবস্থায় স্বরূপত থাকিলেও স্বপ্রকাশ বলিয়া পরিগণিত হন না। বিমর্শ ব্যতিরেকে প্রকাশ এবং অপ্রকাশ উভয়ে

কোনো পার্থক্য থাকে না।"...

"...সৃষ্টির পূর্বে নিত্য-সত্যরূপে শব্দই বিদ্যমান রহিয়াছে, এই শব্দই প্রজ্ঞা। খণ্ড প্রজ্ঞা হইতে পৃথক করিয়া বুঝিবার জন্য ইহাকে পূর্ণপ্রজ্ঞা বা মহাপ্রজ্ঞা বলিলেও ক্ষতি হয় না। বৌদ্ধগণ ইহাকেই প্রজ্ঞা-পারমিতা বলিতেন। ইনি সমগ্র জগতের প্রসূতি, শুধু জগৎ কেন, বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব, সিদ্ধবর্গ এমন কি ঈশ্বর ভাবেরও প্রসূতি। কারণ এই পূর্ণহন্তাই মূল ঐশ্বর্য। ইহা পরমেশ্বরের অথবা আত্মার স্বভাব। বস্তু স্বভাববিরহিত থাকে না, সুতরাং আত্মা স্বরূপস্থিতিকালে কখনোই পূর্ণহন্তা বিরহিত হইয়া থাকে না। St. John-এর Gospel-এ যে বিবরণ আছে তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। অর্থাৎ The Word was with God and the Word was God। "Word" শব্দে এখানে মূল শব্দকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। শব্দ-ব্রহ্ম ইহা ছাড়া অতিরিক্ত কিছুই নহে।" (মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ 'রচনা সঙ্কলন', পৃ ১৩৯-১৪০)

'বিন্দু' সম্পর্কে তিনি লিখছেন—"দ্বৈতবাদিগণ বলেন চিৎশক্তি অথবা পরমেশ্বরের নিত্যসমবেতা পরমাশক্তি বিন্দু নামক শুদ্ধ অচিৎ পদার্থকে স্পর্শ করিলে বিন্দু ক্ষুব্ধ হইয়া সৃষ্টির সূচনা করে। তাই পরমেশ্বরী শক্তি ক্রিয়াশক্তি রূপেই বিন্দুকে ক্ষুব্ধ করিয়া থাকে ইহা মনে রাখিতে হইবে। ইহার যেটি নিষ্ক্রিয়াবস্থা তাহাতে বিন্দুর ক্ষোভ্য-ক্ষোভক ভাব থাকে না। বিন্দুর নামান্তর মহামায়া অথবা কুণ্ডলিনী।" (ঐ পৃ ১৪২)

সাধক নানারকম সাধনার মাধ্যমে কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত করেন। সাধারণ মানুষের ভেতর কুণ্ডলিনী অধোমুখ থাকে। তাই সাধারণ মানুষ কাম-ক্রোধের বশীভূত। সাধক এই অধোমুখী কুণ্ডলিনীকে ঊর্ধ্বমুখী করার চেষ্টা করেন। কুণ্ডলিনী উদ্বুদ্ধ হয়ে আরো ঊর্ধ্বগামী হলে তার উন্মেষকে 'নাদ' বলা হয়। গোপীনাথ কবিরাজ বলছেন—"যখন পরমেশ্বরের স্বরূপভূতা চিৎশক্তি এই বিন্দুকে আঘাত করেন, তখন বিন্দু ক্ষুব্ধ হইয়া নাদরূপে প্রসার প্রাপ্ত হয়। বিন্দু ক্ষুব্ধ না হইলে নাদের আবির্ভাব হইতে পারে না এবং মহাশক্তির স্বাতন্ত্র্যমূলক আঘাত ব্যতিরেকে বিন্দুর ক্ষোভ সম্পাদিত হয় না।" (ঐ পৃ ১৫০) নাদের প্রকাশ হলে তার ব্যক্তরূপই মহাবিন্দু। এই বিন্দু তিন প্রকার— ইচ্ছা, জ্ঞান এবং ক্রিয়া। যোগীদের পরিভাষায় সূর্য, চন্দ্র এবং অগ্নি বলেও কথিত আছে। এমনকী ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবও বলা হয়। এই নাদ আর বিন্দুই অখিল ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত অনাহত নাদের ব্যষ্টির মধ্যে ব্যক্ত রূপ। অর্থাৎ যে নাদ অনাহত হয়ে বিশ্বে ব্যাপ্ত, তারই প্রকাশ ব্যক্তির মধ্যে হলে তাও নাদ-ই।

"বদ্ধ জীব শ্বাস-প্রশ্বাসের অধীন হয়ে (এই শ্বাসের সংখ্যা দিন-রাতে চব্বিশ ঘণ্টায় ২১,৬০০) নিরন্তর ইড়া ও পিঙ্গলা মার্গে রয়েছে। সুষুম্না পথ তার কাছে বন্ধ। তার কারণ বদ্ধ জীবের ইন্দ্রিয় ও মন বহির্মুখী। যে অখণ্ড নাদ জগতের অন্তস্তলে এবং নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে নিরন্তর ধ্বনিত হচ্ছে, তা সে শুনতে পায় না। কিন্তু যখন ক্রিয়া-বিশেষের মাধ্যমে সুষুম্না-পথ উন্মুক্ত হয়ে যায় এবং কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হয়, তখন আত্মা স্থির হয়ে শূন্যমার্গে নিরন্তর ধ্বনিত ওই অনাহত ধ্বনি বা অনাহত নাদ শুনতে পায়।" ('কবীর' পৃঃ ৫২)

এই প্রসঙ্গে 'হঠযোগ-প্রদীপিকা'য় বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

১৬

গগনে ঘনঘটা··· রিম ঝিমতায়— সমাধিকালীন ধর্মমেঘের বৃষ্টি শুরু হয়েছে। পূর্ব জন্মের পুণ্যে। আপনাপন খেতে আল বাঁধ— সংযম-বিধি মেনে চলা দরকার। সুরতি, নিরতি— সাধারণত 'রতি' অর্থে প্রবৃত্তি। নিরতি বহির্মুখী প্রবৃত্তির নিবৃত্তি এবং সুরতি অন্তর্মুখী প্রবৃত্তি। নিরতি অ-ভাবাত্মক বস্তু এবং সুরতি ভাবাত্মক। ক্ষিতিমোহন সেন সুরতির অর্থ প্রেম এবং নিরতির অর্থ বৈরাগ্য করেছেন। বহির্মুখী প্রবৃত্তি যখন অন্তর্মুখী প্রবৃত্তির ভেতর লীন হয়ে যায় তখন জীব আর ব্রহ্মের অভেদ-প্রতীতি জন্মায়। যদিও কবীরপন্থীরা এই অন্তিম অবস্থাকেও স্বীকার করেন না, একে ভ্রমাত্মক বলেই মনে করেন তাঁরা। এঁদের বক্তব্য, নিরতি যখন অভেদ উপলব্ধি-রূপী অহংভাব থেকে মুক্ত হয়ে শব্দে লীন হয়, তখনই জীবের স্বরূপ-উপলব্ধি সম্ভব হতে পারে। এই জগৎকে অন্তঃকরণ আর বাহ্যকরণ দ্বারা উপলব্ধি সম্ভব

হয়ে ওঠে। সুরতি-নিরতি যেন টানা-পোড়েন। নিরতি নিবৃত্তিরূপী হওয়ার দরুণ স্থূল এবং সুরতি অন্তর্মুখী হওয়ার দরুণ সূক্ষ্ম। সুরতি যেন রাগ আর নিরতি যেন বীণার তার। একটি পদে আছে—'গ্রহ চন্দ্র তপন জোত বরত হৈ/ সুরত রাগ নিরত তার বাজৈ।/ নৌবতিয়া ঘুরত হৈ রৈন-দিন শূন্য মে/ কহে কবীর পিউ গগন গাজৈ।।' ধান যে কেটে...... আসে— পরম পুরুষার্থ যে লাভ করে।

প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ থাক, ১৮ এবং ১০০ সংখ্যক পদে গগন, গগনরস, অমৃতবর্ষণ, বাদল— এই সমস্ত শব্দই জীবাত্মার দ্বন্দ্বাতীত কেবলাবস্থা বা সমাধিকালীন ধর্মমেঘের বর্ষণের কথাই বলা হয়েছে।

এই সূত্রেই 'শূন্য' শব্দটির অর্থও জানা দরকার। শূন্য বলতে ধ্যানসমাধির অনির্বচনীয় অবস্থা। শূন্যের অঙ্গাঙ্গী শব্দ 'কমল', 'সহজ', 'গগন'। এর প্রত্যেকটিই স্বতন্ত্রভাবে বিভিন্ন পদে ব্যবহৃত হলেও অর্থব্যঞ্জনায় অভিন্ন।

শশিভূষণ দাশগুপ্ত লিখেছেন—"নাগার্জুনপাদের তান্ত্রিক বৌদ্ধগ্রন্থ 'পঞ্চক্রমে' চারি প্রকারের শূন্যের কথা বলা হইয়াছে,— শূন্য, অতিশূন্য, মহাশূন্য এবং সর্বশূন্য।... চিত্তকে এই শূন্য হইতে অতিশূন্যে, অতিশূন্য হইতে মহাশূন্যে এবং মহাশূন্য হইএত সর্বশূন্যে টানিয়া তুলিতে হইবে,... বহু চর্যাগানের ভিতরে এই উজান-স্রোতে গগনের শেষকূলে পৌঁছাইবার কথা রহিয়াছে।" কবীরের সহজ সাধনার সঙ্গে এই শূন্য অঙ্গাঙ্গী। রামনামামৃতের স্বাদ গ্রহণেরই এক বিশেষ অবস্থা শূন্য। সহজও তাই। বৌদ্ধ সহজিয়া, নাথপন্থী এবং কবীরপন্থীরা— এই পরম্পরায় শূন্য এবং সহজ ব্যবহৃত হয়েছে ধ্যানসমাধির এক পরম সুখাবস্থা বোঝাতে। অনূদিত একাধিক পদে এর ব্যবহার নিশ্চয় পাঠক লক্ষ করবেন।

১৭

তিমিরসন্ধ্যা— প্রিয় সমাগমের সময়। পশ্চিম দিকে খিড়কি— সুষুম্না পথ। শোভাসিন্ধুর মহল—| অন্তঃকরণ। ঘট—শরীর, কায়া। দ্রষ্টব্য ১৩ সংখ্যক অনূদিত পদ। একাধিক পদেই পাঠক এই শব্দটি পাবেন।

সুষুম্না পথ খুলে দিয়ে গগনে অর্থাৎ শূন্যে, সহস্রারে সমাধির জন্য প্রেমের অনুভব করো—এই কথাই বলতে চাওয়া হচ্ছে। আর এই সমাধিকালে শঙ্খ ঘণ্টা ইত্যাদির ধ্বনি প্রথমে শোনা যাবে, কিন্তু তাকে অতিক্রম করে সাধক পরমজ্যোতির দর্শনে পরমাত্মাকে আত্মার মাঝে উপলব্ধি করবেন। এই সূত্রে ৮৭ সংখ্যক অনূদিত পদের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

১৮

গগন— বৌদ্ধ সহজিয়াদের বাণীতে শূন্যের প্রতিশব্দ। এখানে সহস্রার অর্থে ব্যবহৃত। গগন-গুম্ফা অর্থে জীবাত্মার দ্বন্দ্বাতীত কেবলাবস্থা, যেখানে পৌঁছলে যোগী সুখ-দুঃখের অনুভূতির অতীত হয়ে যায়। বাদ্যযন্ত্র ছাড়াই সেখানে ঝংকার ওঠে, আর তা একমাত্র ধ্যানমগ্ন যোগীই উপলব্ধি করতে পারে।

কমলিনী— সহস্রদল পদ্ম বা সহস্রার চক্র। তান্ত্রিক সাধন-প্রণালীর সূত্রে বৌদ্ধ সহজযানী এবং নাথপন্থীদের সূত্রে কবীর-পদাবলিতেও এটি উপস্থিত। মেরুদণ্ডকে অবলম্বন করে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ এবং আজ্ঞা—এই ছটি চক্র, যা আবার পদ্ম হিশেবেও কল্পিত— প্রতিটি পদ্মের দলসংখ্যাও আবার বিভিন্ন, ষটচক্র নামেই প্রসিদ্ধ। সহস্রারের অবস্থান আজ্ঞার ওপরে অর্থাৎ মস্তিষ্কে। নিদ্রিত শক্তিকে মূলাধারে জাগ্রত করে প্রবৃত্তি থেকে নিবৃত্তির পথে— কবীরের বাণীতে নিরতি থেকে সুরতির দিকে— উলটা-সাধনের ভেতর দিয়ে সহস্রারে পৌঁছোনোই সাধকের কর্ম। দেহই ব্রহ্মাণ্ড, তাই কায়া-সাধন।

চন্দ— চাঁদ, চন্দালো— চাঁদের আলো। না ওঠে চন্দ... চন্দালো— কবীরের বক্তব্য এই যে, প্রফুল্লতা বা আহ্লাদিত অবস্থা গুণময় আধারে পাওয়া যায় না। কিন্তু আনন্দলোকে পৌঁছলে, নির্গুণ ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধি হলে তবেই তা পাওয়া যায়। আর তখন সেখানে ফুলের আকার নেই যেমন, তেমনই তার গুণময় হেতু জলাশয়ও নেই। প্রফুল্লতা, আহ্লাদ এইসবই অখণ্ড ধর্মের বিভূতি মাত্র। দ্বিবেদীজী এভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমাদের আরো কিছু অনুসন্ধান প্রয়োজন হয়ে পড়ে। শশিভূষণ দাশগুপ্ত জানাচ্ছেন— "নাথসিদ্ধাগণ ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডে দুইটি তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন, চন্দ্রতত্ত্ব এবং সূর্যতত্ত্ব। চন্দ্রই সুধাকর, সুধাই অমৃত— অমৃত পানের দ্বারাই অমরত্ব লাভ হয়। চন্দ্রই সোম,— অমরত্ব লাভের জন্যই দেবতাগণ সোম পান করিতেন। এই চন্দ্রতত্ত্বই ব্রহ্মাণ্ডের অমৃততত্ত্ব। সূর্য বৈশ্বানর,— সে কালাগ্নি— সে-ই সৃষ্টির সংহারতত্ত্ব। এই সূর্য-চন্দ্র বা অগ্নিসোমাত্মক সমগ্র বিশ্ব,— আর যে তত্ত্ব রহিয়াছে এই ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডে তাহাই রহিয়াছে এই দেহ-ভাণ্ডে।" ('ভারতীয় সাধনার ঐক্য'।)

এই সূত্রেই আমাদের 'হঠযোগ' শব্দটির দিকে দৃষ্টিপাত করা দরকার। উপেন্দ্রকুমার দাস লিখেছেন—"যোগশিখাপনিষদের মতে হকার সূর্য আর ঠকার চন্দ্র। সূর্য এবং চন্দ্রের ঐক্যকে হঠযোগ বলা হয়।

সূর্য প্রাণবায়ু, চন্দ্র অপানবায়ু। প্রাণ ও অপান বায়ুর ঐক্য অর্থাৎ সংযোগ হঠযোগ।

আবার কোনো কোনো মতে যে-যোগে হঠাৎ সিদ্ধিলাভ হয় তাই হঠযোগ।

যোগসাধনা প্রত্যক্ষফলপ্রদ। সাধনায় খানিকটা অগ্রসর হলেই যোগী ফল পেতে আরম্ভ করেন। আরো অগ্রসর হলে তাঁর অণিমা লঘিমা প্রভৃতি সিদ্ধিলাভ হতে থাকে।

কিন্তু হঠযোগের চরম সিদ্ধি পরমাত্ম-সাক্ষাৎকার। একেই বলা হয় পরমপদপ্রাপ্তি। ষটকর্ম, আসন, মুদ্রা, প্রত্যাহার, প্রাণায়াম, ধ্যান এই ক্রমানুসারে সাধনা করে যোগী যখন সমাধিলাভ করেন তখনই তাঁর পরমাত্ম-সাক্ষাৎকার হতে পারে।

হঠযোগ সাধনা গুরুগম্য। এইজন্য, হঠযোগীদের কাছে গুরুর স্থান সর্বোচ্চ। তাই, নাথপন্থীদের কাছেও গুরুর বাড়া কেউ নেই। যোগসাধনার বিষয়ে অনেক ক্ষেত্রে পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এইসব শব্দের অর্থ এবং গুহ্য সাধনার সংকেত গুরুর কাছ থেকে জানতে হত।" (ভক্ত কবীর', পৃ ৫০-৫১)।

যোগসাধনার ক্ষেত্রে 'মুদ্রা'-র উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। এবার, সেই মুদ্রা তথা 'খেচরী মুদ্রা'-প্রসঙ্গে আসা প্রয়োজন। এই মুদ্রায় যোগী জিভ উলটে কপাল-কুহরে প্রবেশ করান অর্থাৎ তালু স্পর্শ করেন। দৃষ্টি তখন ভ্রূ-মধ্যস্থিত রন্ধ্রে অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রে নিবদ্ধ করার প্রয়োজন হয়। অনেক আয়াসে এই মুদ্রা প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু একবার যদি তা পারেন, তাহলে যোগী বিষ এবং ব্যাধিমুক্ত হতে সক্ষম হন। এই মুদ্রার বিশিষ্টরূপ ব্যোমচক্র। ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রার পদ্মের মূলে যোনি নামক ত্রিকোণাকার শক্তিকেন্দ্র যেটি রয়েছে, সেখানেই চন্দ্রমার স্থান। সর্বদা অমৃত নিস্যন্দী সেই চন্দ্রমা। খেচরী মুদ্রার সাহায্যে যোগী সেই অমৃতরস পান করতে থাকেন। এই অমৃত সোমরস। এই রস পান করেই যোগী অমরত্ব লাভ করেন। প্রকৃতপক্ষে যোগী কুলীন বলে বিবেচিত হন তখনই, যদি সেই নিত্য 'গোমাংস' ভক্ষণ করতে পারেন এবং উপর থেকে অমর-বারুণী নামক সেই মদ পান করতে পারেন। 'গো' অর্থে জিহ্বা। তাকে উলটে তালু স্পর্শ করানোর অর্থই হল 'গোমাংস ভক্ষণ'। ওই চন্দ্রমা থেকে ক্ষরিত সোমরস পানের অভ্যাসও তাঁর থাকতে হয়, যা অমর-বারুণী বলে কথিত। এই দুই কৃত্য যিনি সাধন করেন তিনিই কুলীন বিবেচিত হন। 'হঠযোগ-প্রদীপিকা'-য় এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। 'তৃতীয়োপদেশঃ' দ্রষ্টব্য।

এই সূত্রেই কবীরের মনোন্মনী অবস্থার কথা স্মরণীয়। ৫১ সংখ্যক অনূদিত পদে তারই বিবরণ। হঠযোগের তত্ত্বে বলা হচ্ছে, সৃষ্টিময় বীজই একমাত্র বীজ, খেচরী মুদ্রাই একমাত্র মুদ্রা, নিরালম্ব দেবই একমাত্র দেব, মনোন্মনী অবস্থাই একমাত্র অবস্থা। এই মনোন্মনী অবস্থার প্রাপ্তি সম্পর্কে গোপীনাথ কবিরাজ লিখছেন—"...বিশুদ্ধ চিদালোককে পাইতে হইলে উপাধিরূপ দর্পণকে অতিক্রম করা আবশ্যক হয়, কিন্তু আবশ্যক হইলেও উহা সহজসাধ্য ব্যাপার নহে। একাগ্র ভূমি হইতে নিরোধ ভূমির মধ্য দিয়া যোগীর গতিমার্গ নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। এই নিরোধ চিত্তের নিরোধ-বৃত্তিরও নিরোধ এবং সংস্কারেরও নিরোধ। নিরোধ পূর্ণ হইলে বৃত্তি তো থাকেই না, সংস্কারও থাকে না—বলিতে কি তখন নিরোধও থাকে না। প্রকৃত প্রস্তাবে তখন চিত্তই থাকে না, থাকে শুধু বিশুদ্ধ চৈতন্য। চিত্তের সম্যক অভাবই উন্মনা ভাব। ইহাই বিশুদ্ধ চৈতন্যের স্বরূপ-শক্তি বা নিজ-শক্তি রূপে যোগি-সমাজে পরিচিত।" ('মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ রচনা সঙ্কলন', পৃ ৩২৬)

হংস— শুদ্ধ জীবাত্মা। ১৮ সংখ্যক পদে এই অর্থেই শব্দটির ব্যবহার। কিন্তু অন্যত্র শুদ্ধ জীবাত্মা এবং পরমাত্মা উভয়ক্ষেত্রেই হংস শব্দটি ব্যবহৃত। যেমন, 'কহৈ কবীর স্বামী সুখসাগর হংসহি হংস মিলাবহিংগে' (দ্র ৮৮ সংখ্যক অনূদিত পদ)। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, রামপ্রসাদের গানে আছে—

মন কী করো ভবে আসিয়ে।
ওরে দিবা অবশেষ, অজপার শেষ,
ক্রমেতে নিঃশ্বাস যায় ফুরায়ে॥
হং বর্ণ পূরকে হয়, সং বর্ণ রেচকে হয়,
অহর্নিশি করো জপ 'হংস হংস' বলিয়ে॥

দশম দ্বার— নাথসিদ্ধাদের সূর্য ও চন্দ্রতত্ত্বের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। খেচরী মুদ্রার কথাও আগে প্রসঙ্গক্রমে এসেছে। এবং চন্দ্রের অবস্থান সম্পর্কেও অবগত হওয়া গেছে। এবার দশমী দ্বার প্রসঙ্গে— "দেহের ভিতরে ঊর্ধ্বে তালুমূলে অবস্থিত এই চন্দ্র, আর নাভিদেশে অবস্থিত দহনাত্মক সূর্য; এই চন্দ্র হইতে এক 'বঙ্ক নালে' অমৃতধারা নিম্নে ক্ষরিত হইতেছে, নিম্নের দহনাত্মক সূর্য সেই অমৃত গ্রাস করিতেছে। সূর্যের গ্রাস হইতে যোগের দ্বারা এই চন্দ্রের অমৃত রক্ষা করিতে হইবে। এই 'বঙ্কনালী'র মুখই 'দশমী দ্বার', সেই 'দশমী দ্বার' রুদ্ধ করিয়া চন্দ্রের অমৃতধারাকে রক্ষা করিতে হইবে,—সেই অমৃত পান করিতে পারিলেই যোগী অমরত্ব লাভ করিতে পারেন। চন্দ্রের ধারা স্বভাবত নিম্নগা, এই নিম্নগা ধারাকে ঊর্ধ্বগা করিয়া তাহাকে রক্ষা করিতে হয়,—এবং এইরূপেই ধ্বংসাত্মক সূর্যের হাত হইতে দেহকে রক্ষা করিতে হয়। এই অমৃতই নাথসিদ্ধাদের বহুকথিত 'মহারস'—— এই মহারসকে ঊর্ধ্বগা করিয়া প্রথমে স্থূলদেহকে সূক্ষ্ম দিব্যদেহে পরিণত করা, এবং সেই দিব্যদেহকে সাধনা বলে পুনরায় বৈষ্ণব দেহে পরিণত করা এবং তদ্দ্বারা শিবত্ব প্রাপ্তি— ইহাই নাথসিদ্ধাদের উল্টাসাধন।" ('ভারতীয় সাধনার ঐক্য'/ শশিভূষণ দাশগুপ্ত পৃ ৫০-৫১) এই সূত্রে ৯৭ সংখ্যক অনূদিত পদটি দ্রষ্টব্য।

২২

গৌনা— সকলেই জানেন আগেকার দিনে মেয়েদের অল্প বয়েসে বিয়ে হত। রজঃস্বলা হবার আগে বিয়ে হলে তাকে বলা হত গৌরী-দান। বিয়ের পরে মেয়ে থাকত বাপের বাড়িতেই; পরে উপযুক্ত হলে তাকে স্বামীর ঘর করতে পাঠানো হত। অপেক্ষাকৃত বড় হয়ে শ্বশুর বাড়ি যাবার এই বিষয়টিকেই হিন্দি-ভাষী এলাকায় গৌনা বলা হয়।

এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় প্রাচীন বাংলার লোকজীবনের একটি ছড়া—

আট বারো বছরের গৌরী তেরো নয়রে পড়ে
ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাছা আমার মায়ের আঁচল ধরে।
টাকা নয় রে কড়ি নয় রে কোটরে রাখিব
পরের লাগ্যা হইছে গৌরী পরের সে দিব।
('আইকম বাইকম,' কমলকুমার মজুমদার সম্পাদিত)

২৩

কনে বউ— জীবাত্মা। আঙিয়া— সাধারণ অর্থ অঙ্গবাস। এখানে শরীর।

৩০

পাঁচ সখী— পঞ্চপ্রাণ। দ্বাদশের পরে— দশ ইন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধি, এই নিয়ে দ্বাদশ; তারও পরে, অর্থাৎ পরমব্যোম। যেখানে অদ্বয় স্থিতি বা মনোন্মনী অবস্থা। এই উন্মনাভূমি দ্বাদশান্তেরও ওপরে। গোপীনাথ কবিরাজ বলছেন—"দ্বাদশান্ত ললাটের ঊর্ধ্বে কপালের ঊর্ধ্বস্থান পর্যন্ত, কিন্তু পরমব্যোম কাহারও মতে শিরোদেশ হইতে দুই আঙুল ঊর্ধ্বে অবস্থিত।" (রচনা সঙ্কলন— 'দেহবিজ্ঞান ও অমরত্ব সাধন', পৃ ২২১)

৩৬

আট কুঁয়া আর নয়টা পুকুর—অষ্টদিক (পূর্ব, অগ্নি, দক্ষিণ, নৈঋর্ত, পশ্চিম, বায়ু, উত্তর, ঈশান) এবং নবখণ্ড অর্থাৎ সমূহ জগৎ। কুয়ো এবং পুকুরের অর্থ এই যে জীব তার জীবনরস এইসব থেকেই সংগ্রহ করে। জলের অপর নাম জীবন।

ষোড়শ নারী— ষোড়শ বিকার: পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক), পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় (বাক, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ), মন এবং পঞ্চভূত (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম)— এই মিলে ষোড়শ বিকার। আর এই বিকার একত্র হয়ে রচনা করেছে প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের বন্ধন। পুরুষের এই বন্ধন দুঃখময়। শশিভূষণ দাশগুপ্ত লিখছেন—"এই ষোড়শ বিকারের পশ্চাতে প্রথমে অহংতত্ত্বকে আবিষ্কার করিতে হইবে,—অহংতত্ত্বকে সমর্পণ করিতে হইবে বুদ্ধিতত্ত্ব বা মহৎ-তত্ত্বে; তখন বিবেকখ্যাতি দ্বারা অনুভব করিতে হইবে পুরুষ এবং প্রকৃতির পার্থক্য; এই বিবেক-প্রতিষ্ঠা হইলেই পুরুষ সমস্ত বিকারের বন্ধন হইতে তাঁহার নিঃসঙ্গ 'কেবল' স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন, এই স্বরূপ-প্রতিষ্ঠাতেই দুঃখের অত্যন্তাভাব,—ইহাই মুক্তি। উপচারিত বন্ধন হইতে 'কেবল' স্বরূপে প্রত্যাবর্তনই মুক্তি। পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রে বলা হইয়াছে চিত্তবৃত্তির নিরোধের দ্বারাই মুক্তি হয়; কারণ, তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম—তখন দ্রষ্টা পুরুষ তাঁহার চিন্মাত্র কেবলরূপে অবস্থান করেন।" ('ভারতীয় সাধনার ঐক্য' পৃ ১৭-১৮)

ছলকে ওঠে জল ভরা ঘট—ঘট অর্থে শরীররূপী ঘট। ছলকে ওঠে জল, অর্থাৎ প্রাণশক্তি নিঃশেষ হয়ে যাওয়া। চাট্টি বাহক—শব বহনের জন্য চারজন লোক।

৩৮

খসম— বর্তমান পদে খসম শব্দের অর্থ পতি বা স্বামী। আরবি শব্দ খসম-এর (বানানভেদে খশম) এই অর্থ কবীরের পদটিতে হলেও এর সংস্কৃত অর্থ অন্যরকমের। সংস্কৃত খসম = খ-সম অর্থাৎ 'গগনোপম'। হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী জানাচ্ছেন—"সহজযানীরা এই শব্দের প্রয়োগ শূন্যাবস্থা এবং নৈরাত্ম্য-ভাব বোঝাতেই ব্যবহার করতেন। এই ভাবব্যঞ্জক শব্দটির যোগী এবং তান্ত্রিকদের সাহিত্যে অর্থ বদলে গেছে। নৈরাত্ম্যের জায়গায় তাঁরা 'ভাবাভাববিনির্মুক্তাবস্থা' বোঝাতে ব্যবহার করেছেন, অর্থাৎ বৌদ্ধরা যেখানে এই শব্দ আত্ম-লোপ অর্থে বলতে চেয়েছেন (নৈরাত্ম্য), সেখানে যোগী এবং তান্ত্রিকরা এর দ্বারা সেই অবস্থাই বোঝাতে চেয়েছেন—না কোনো ভাবের না কোনো অভাবের অনুভব থাকে—না সেখানে অস্তি, না কোনো নাস্তি (ভাব-অভাববিনির্মুক্ত-অবস্থা)। এটি যোগীদের দুর্লভ সহজাবস্থা। লক্ষণীয় বিষয় এই যে এই অবস্থা বোঝাতে যোগীরা 'খসম'-এর তুল্যার্থক 'গগনোপম' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। 'অবধূত-গীতা'য় এই গগনোপমাবস্থার বিস্তৃত বর্ণনা আছে। গগনোপমাবস্থা (অর্থাৎ খ-সম অবস্থা) বলতে দ্বৈত এবং অদ্বৈত, নিত্য এবং অনিত্য, সত্য এবং অসত্য, দেবতা এবং দেবলোকাদি কোনো কিছুই প্রতীত হয় না যে অবস্থায়, যা মায়াপ্রপঞ্চের উর্ধ্বে, যা অহংভাবের অতীত যা সত্য এবং অসত্যের উর্ধ্বে, সেখানে জ্ঞানরূপী অমৃত পান" করা যায়। 'খসম' সম্পর্কে দ্বিবেদীজী আরো জানাচ্ছেন—"এই শব্দ যখন কবীরদাসের সময়ে এসে পৌঁছল তখন মিলেজুলে আরবি শব্দ খসমও (= পতি) ভারতবর্ষের সীমায় এসে পৌঁছে গেছে। কবীরদাস এই শব্দ মূল উৎস থেকেই প্রাপ্ত হয়েছিলেন। হঠযোগীদের মাধ্যমে এই শব্দ, আত্মা শূন্যচক্রে পৌঁছে সমভাব প্রাপ্তির অবস্থা— এই অর্থেই এসেছিল। কিন্তু মুসলমানী সূত্রে পতি অর্থে এই শব্দের আগমন ঘটে। আমরা আগেই দেখেছি কীবরদাস যোগীদের কৃচ্ছ্রাচার দ্বারা প্রাপ্ত সমাধিকে খুব উঁচু অবস্থা বলে মনে করতেন না। ... এইজন্যই কবীরদাস শূন্য সমাধিমগ্ন গগনোপমাবস্থা বা খসমভাবকে ক্ষণিক আনন্দই মনে করতেন, বড় ব্যাপার বলে মনে করতেন সহজসমাধিকে, যার জন্য না কোনো দণ্ডের প্রয়োজন, না কন্থার, না কোনো মুদ্রা আবশ্যক, না কোনো আসন। এই কারণেই খসমের অর্থ সবসময় তাঁর কাছে 'নিকৃষ্ট পতি' হিসেবেই বিবেচিত হয়েছে। অর্থাৎ যৌগিক ক্রিয়াসমূহে মুগ্ধ হয়ে থাকা—এই অর্থে প্রয়োগ করেছেন। তাছাড়াও, খসম অর্থে যে স্বামী নিজের স্ত্রীকে বশে রাখতে পারে না। ইন্দ্রিয়ের দাস মনকেও কবীরদাস কখনো কখনো খসম বলেছেন। কবীরদাসের নামে প্রচলিত পরবর্তীকালের অনেক ভজনেই এই দ্বিতীয় অর্থেই অধিক প্রয়োগ লক্ষ করা

যায়। টীকাকার এবং ভক্তরা নিজেদের উর্বর কল্পনায় এই শব্দের অর্থ কখনো জীব, কখনো মন আবার কখনো পরমাত্মাও করেছে।" ('কবীর', পৃ ৭৬-৭৭)

এই সূত্রে দ্রষ্টব্য ৭১ সংখ্যক অনূদিত পদের পঞ্চম ও ষষ্ঠ চরণ (জ্বলে গেল কন্থা ···খর্পরও তো ফুটি) দুটি। কবীরের বক্তব্য এই যে ভালো মনে যদি ভগবদ্ভক্তি না হয় তো শরীরের সাধনায় আর কতদূর যাওয়া যায়। এক্ষেত্রে আমাদের পক্ষে অবশ্য স্মরণীয় বিষয় এই যে, সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক—এই তিন প্রকার যোগসাধনা হয়ে থাকে। কবীর প্রথম পন্থার পক্ষেই ছিলেন। হঠযোগের অপরনাম রাজযোগ। ভক্ত কবীর যখন এই দ্বিতীয় পন্থার পথিকদের বিরোধিতা করেন, তখনো কিন্তু মনে রাখা দরকার সিদ্ধ যোগীপুরুষ সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন না, এমন নয়। শ্রীমদ্ভাগবতে পুণ্যবান ব্যক্তিদের যে শ্রেণীকরণ করা হয়েছে, সেখানে কবীরের মতো ভক্ত মানুষ, তথা নিত্যযুক্ত একনিষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞানী যাঁর ভেতর অহৈতুকী ভক্তি বর্তমান—তাঁদের প্রসঙ্গও উল্লেখিত।

৪৭

কুম্ভবৃত্তি— ভগবদমহিমা।

৫১

মহারস— দ্র ১৮ সংখ্যক পদের 'দশম দ্বার' শব্দের আলোচনা।

ত্রিবেদীজী লিখছেন— এই পদে বলা হচ্ছে, মদিরায় (পঞ্চমকারের এক প্রধান উপাদান) মত্ত হওয়াই বড় কথা নয়। জ্ঞান এবং ধ্যানের দ্বারা ভগবানের যে পরিচয় মেলে, সেটাই বাস্তবিক সুখানুভূতির কারণ হতে পারে। কৃচ্ছ্রসাধনে কেবল দুঃখতাপই বাড়ে। কিন্তু আন্তরিক জ্ঞানেই ভগবদপ্রাপ্তির সম্পূর্ণ আনন্দ পাওয়া সম্ভব। আর তখনই তো পরমজ্যোতির ভেতর আত্মজ্যোতি লীন হয়ে যায়। স্মরণীয়, রামপ্রসাদের গানে আছে—

> ওরে সুরাপান করিনে আমি,
> সুধা খাই জয় কালী ব'লে।
> মন-মাতালে মাতাল করে,
> মদ-মাতালে মাতাল বলে।।
> গুরু-দত্ত গুড় লয়ে, প্রবৃত্তি-মশলা দিয়ে মা,
> আমার জ্ঞান-শুঁড়িতে চুয়ায় ভাটি
> পান করে মোর মন-মাতালে।
> মূল মন্ত্র যন্ত্র ভরা, শোধন করি ব'লে তারা, মা,
> রামপ্রসাদ বলে এমন সুরা
> খেলে চতুর্বর্গ মেলে।

৫৪

বিন্দু— বীর্য। বিন্দু ধরে রাখা, অর্থাৎ বীর্যধারণ করা। কবীরের বক্তব্য এখানে যথেষ্ট প্রাঞ্জল। আত্মারামকেই যদি না চিনলে তুমি তাহলে কৃচ্ছ্রসাধনে তোমার কী যায় আসে।

বিন্দুধারণ সমস্ত ধর্মেই সাধনপথে বিশেষ কৃত্য হিসেবে বিবেচিত হয়। কবীর ভক্তি এবং প্রেমের পথে ঈশ্বরের জন্য যে ব্যাকুলতা প্রকাশ করেন সেখানে বাহ্যাচারের আড়ম্বর নেই। তাঁর অন্তর্মুখী চেতনায় রামনামের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করেছেন বলেই বাহ্যাচারকে আঘাত করতে চেয়েছেন। আর সেই আঘাত বেজে উঠেছে বারংবার তাঁর নামোদ্ধৃত বিভিন্ন পদে। এই সূত্রেই স্মরণীয় ৬৩ সংখ্যক অনূদিত পদটিতে তাঁর বক্তব্য। হৃদয়ে যদি প্রেম না জন্মায় তাহলে সকলই বৃথা। প্রেম-মার্গী কবীর যেহেতু আত্মজ্ঞানী সিদ্ধপুরুষ, তাই তাঁর কাছে আত্মজ্ঞানহীন উপলক্ষ্যের চর্চা পরিত্যাজ্য বলেই গণ্য হয়েছে।

বিন্দুধারণ-প্রসঙ্গে ফকিরিভক্তের বক্তব্যও এই সূত্রে স্মরণীয় হয়ে ওঠে।—"আমদের মারফতী মতে

বলে, দেহের ওপরে হল চামড়া, চামড়ার মধ্যে রক্ত, রক্তের মধ্যে মাংস, মাংসের মধ্যে মেদ, মেদের মধ্যে অস্থি, অস্থির মধ্যে মজ্জা আর সেই মজ্জার মধ্যে শুক্র। এখন বুঝুন শরীরের পঞ্চাশ বস্তুর মধ্যে শুক্রই প্রধান। সেই শুক্রের মধ্যে আছে প্রাণের বীজ। এবারে বুঝে নিন সেই প্রাণের মধ্যে আছে আত্মারাম, আত্মারামের মধ্যে পুষ্প, পুষ্পের মধ্যে কলি, কলির মধ্যে চিৎশক্তি, চিৎশক্তির মধ্যে মন, মনের মধ্যে ভাব, ভাবের মধ্যে রস, রসের মধ্যে প্রেম। আর সেই প্রেমের মধ্যে আছে সহজবস্তু। অমরা শেষপর্যন্ত সেই সহজবস্তুর সন্ধানী তাই প্রেম আমাদের অবলম্বন। এসব কিছুর মূলে শুক্র, তাই শুক্র রক্ষা করতে হবে। শুক্রহানি ঘটলেই তাই সহজের পথ টলে যাবে।"

... "শুক্রই যদি প্রধান উপাদান তো সেই শুক্রের উৎপত্তি কোথা থেকে? সেও কি রক্তমাংস মেদ মজ্জার মতো মানুষের জন্মগত অর্জন?"

—"জন্মগতই যদি হবে তাহলে যৌবনের আগে বিন্দু আসে না কেন?"

—"আপনিই বুঝিয়ে দিন।"

—"ভাববেন না আমি পয়গম্বর পীর। অনেকদিন ধরে বহু গুরু মুর্শেদের সঙ্গ তারপর অনেক কামেল ফকিরের বাহাছ শুনে তবে এ সব মনের মধ্যে গেঁথেছে। যাইহোক, এখন প্রশ্ন হলো, বিন্দুর উৎপত্তি যদি জন্মগত নয় তবে আসে কোথা থেকে? এ প্রশ্নের এককথার জবাব, পঞ্চভূত হতে। অর্থাৎ পঞ্চভূতের প্রভাবে জন্মায় খাদ্যশস্য দানাপানি। সেই থেকে তৈরি হয় জীবাহার। মানুষ সেই আহার্য থেকে রস টানে। সেই রস চামড়া থেকে শেষপর্যন্ত বিন্দুতে তৈরি হয়। সেইজন্য বারো চৌদ্দ বছর লাগে মানুষের দেহে বিন্দু সৃজন হতে।" ("গভীর নির্জন পথে'/ সুধীর চক্রবর্তী, পৃ ৯৪-৯৫)

৬৯ এবং ৭০

গুরু, সদ্‌গুরু— গুরু প্রণামের মন্ত্রে বলা হচ্ছে : 'অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম।/ তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।' অর্থাৎ, 'যিনি অখণ্ড মণ্ডলাকার চরাচর বিশ্বের ব্যাপক পরমপদকে প্রদর্শন করেন তিনিই গুরু।' এই সঙ্গেই বলা হয়েছে—'অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।/ চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।' অর্থাৎ, 'যিনি অজ্ঞানতিমিরপ্রভাবে অন্ধীভূত শিষ্যের নেত্রকে জ্ঞানরূপ অঞ্জন-শলাকা দ্বারা উন্মীলিত করিয়া দেন তিনিই গুরু।'

গোপীনাথ কবিরাজ জানাচ্ছেন—..."প্রতি মানুষের জ্ঞানচক্ষু এবং অজ্ঞানচক্ষু উভয়ই বিশ্বপ্রকৃতির দান। ...... সাধারণ অবস্থায় অজ্ঞান-চক্ষু ক্রিয়াশীলতাবশত মানুষ দ্বিনেত্র। নির্বিকল্প সমাধিকালে অথবা যে কোনো উপায়ে সম্ভূত জ্ঞানের উন্মেষকালে মানুষ ক্রিয়াশীল জ্ঞানচক্ষুসম্পন্ন এবং একনেত্র বলিয়া অভিহিত হয়। উক্ত অবস্থার তিরোভাব হইলে পুনর্বার অজ্ঞানের প্রাদুর্ভাব হয় এবং মানুষ দ্বিনেত্ররূপে ব্যবহার-ভূমিতে সঞ্চরণ করে। জ্ঞানের অবস্থায় একমাত্র জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত থাকে বলিয়া শাস্ত্রীয় ব্যবহারে প্রাচীনকালে প্রজ্ঞাচক্ষু শব্দে অন্ধকে বুঝাইত। অবস্থার পূর্ণতা সিদ্ধ হইলে জ্ঞানশক্তি ও অজ্ঞানশক্তি উভয়ই নিজের আয়ত্তে থাকে। তখন মনুষ্য ইচ্ছা অথবা প্রয়োজন অনুসারে উভয় শক্তি সমুচিত ভাবে বা বিকল্পিত ভাবে ব্যবহার করিতে পারে।

এই জ্ঞানচক্ষুই মহাজন-সমাজে তৃতীয় নেত্র নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহা খুলিয়া দেওয়া ও জ্ঞান দান করা একই কথা। ইহাই গুরুর কাজ।" ('রচনা সঙ্কলন' পৃ· ৮)

সদ্‌গুরু প্রসঙ্গে তিনি লিখছেন—"'সদ্‌গুরু' শব্দের প্রয়োগ শাস্ত্রে নানাস্থানে নানাপ্রসঙ্গে উপলব্ধ হয়। বহু স্থানে যে 'গুরু' ও 'সদ্‌গুরু' শব্দের প্রয়োগ অভিন্নার্থে হইয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কোনো কোনো স্থানে 'সৎ' এই পূর্ব নির্দিষ্ট বিশেষণের দ্বারা অসদ্‌গুরু হইতে গুরু বিশেষের বৈলক্ষণ্য দ্যোতনা করা হয়, ইহাও অস্বীকার কর যায় না।" (ঐ পৃ ১২)

"যে গুরু অখণ্ড পদে স্থাপন করিতে পারেন না তিনি গুরুরূপে পরিচিত হইলেও প্রকৃত সদ্‌গুরু নহেন, কারণ, নিরবচ্ছেদ মুক্তিই মুক্তি। অবচ্ছেদবিশিষ্ট গণ্ডীসংযুক্ত মুক্তি পূর্ণ মুক্তি নহে এবং যিনি পূর্ণ মুক্তি দিতে না পারেন তিনি গুরু হইলেও প্রকৃত গুরু নহেন, কারণ, অবশিষ্ট সূক্ষ্ম বন্ধনের জন্য গুরুর প্রয়োজনীয়তা তখনো থাকিয়া যায়। এইজন্যই অখণ্ডমণ্ডলরূপ পরমপদই গুরুরও প্রদর্শনীয় এবং

শিষ্যেরও প্রাপ্য।... বিশুদ্ধ জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলন হইলে অখণ্ডরূপে এই অদ্বৈত সত্তা দ্রষ্টার সহিত অভিন্নভাবে খুলিয়া যায়। যিনি নিজ মহিমায় এবং অপার করুণায় এই অখণ্ড সত্তার সহিত অভেদ উপলব্ধির দ্বার খুলিয়াছেন তিনিই গুরু, তিনিই নমস্য।" (ঐ পৃ ১২)

কবীরের এই পদ দুটিতে গুরু এবং সদ্‌গুরুর যে মাহাত্ম্যকীর্তন করা হয়েছে, তার তাৎপর্য অনুভবের জন্য আমাদের আরো দু-একটি ব্যাপারে দৃষ্টিপাত করাও প্রয়োজনীয়। লক্ষণীয়, উদ্ধৃত প্রথম শ্লোকটিতে 'তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ' একথা বলা হয়েছে। গোপীনাথ কবিরাজ জানাচ্ছেন—"তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ বলিতে এই চৈতন্যরূপা শক্তিসংযুক্ত পরমগুরু তত্ত্বই জীবের নমস্কারের বিষয়রূপে লক্ষিত হইয়াছে। নমঃ বলিতে বুঝায় ন মম অর্থাৎ আমার নয়, অর্থাৎ তোমার বা তাঁহার। আমি ভাব এবং তন্মূলক মমত্বভাব যাঁহাকে অর্পণ করা যায় তাহাই আমির পক্ষে নমস্য। এই নমস্কার শ্লোকে শ্রীগুরুতে আত্মসমর্পণের কথা বলা হইয়াছে। শুধু গুরুমাত্রে নহে।

শ্রীগুরুর স্বরূপটি বুঝাইবার জন্য শ্লোকের পূর্বাংশ উপদিষ্ট হইয়াছে। এই স্থানে পরমতত্ত্ব উপেয়রূপে এবং উপায়রূপে দুইভাবেই স্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট হইয়াছে। যিনি উপেয় তাঁহাকে পরমপদ বলিয়া অর্থাৎ বিষ্ণুর পরমপদ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। ইহা ভগবদ্ভাবেরও অতীত পরমাবস্থা। যিনি এই পরমপদকে জীবের নিকট প্রকাশিত করেন তিনিই গুরু।" (ঐ পৃ ১-২)

আত্মজ্ঞানী সিদ্ধপুরুষ কবীর এই গুরুর কথাই বলতে চেয়েছেন। এখানে আরো একটি প্রসঙ্গ সামান্য আলোচনার দাবী রাখে। বিষয়টি হল 'সংতর্ক' বা 'শুদ্ধবিদ্যা'। "...কাহারও 'সংতর্ক' গুরুর উপদেশ হইতে জন্মে, কাহারও বা শাস্ত্র হইতে জন্মে। কিন্তু এমন উত্তম সাধকও আছেন, যাঁহার 'সংতর্ক' গুরুর উপদেশ বা শাস্ত্রাদির অপেক্ষা না করিয়া আপনা আপনি (স্বতঃ) উদিত হয়। ইহার বস্তুবিষয়ক সুনিশ্চিত জ্ঞান আপনা হইতেই (স্বতঃ) উৎপন্ন হয়—তাহা গুরু প্রভৃতির অধীন নহে। এই জ্ঞানও যেমন স্বভাবসিদ্ধ, তেমনিই এই প্রকার তত্ত্বনিষ্ঠ সাধকও স্বভাবসিদ্ধ (সাংসিদ্ধিক)। তবে এই জ্ঞান নিতান্তই যে নিমিত্তহীন তাহাও নহে, কারণ ভগবানের শক্তিপাত প্রভৃতি অদৃষ্ট নিমিত্ত অবশ্যই আছে। তবে লৌকিক নিমিত্ত নাই, ইহা সত্য।" (ঐ পৃ ১৫)

এই 'সংতর্ক' যাঁর ভেতর স্বতঃস্ফূর্ত হয় তাঁর অধিকার দুর্দমনীয়। তাঁর বাহ্যদীক্ষা, বাহ্য অভিষেক কিছুরই প্রয়োজন হয় না। তিনি নিজের সম্যক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হন। নিজের ইন্দ্রিয়বৃত্তি সমূহকে অন্তর্মুখী করে নিজের আত্মার সঙ্গে ঐক্য রচনা করেন। তাঁর সুপ্ত চৈতন্যের জাগরণ ঘটান। এই তাঁর দীক্ষা। যে ক্রিয়ার ফলে তিনি সর্বত্র স্বাতন্ত্র্য লাভ করেন, সেইটিই তাঁর অভিষেক। আমরা এতক্ষণ গুরু, সদ্‌গুরু, শ্রীগুরু এই শব্দগুলির সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। এছাড়াও 'কল্পিত' 'অকল্পিত', 'কল্পিতাকল্পিত' এবং 'অকল্পিতকল্পক' গুরু আছেন।

সমস্ত সদ্‌গুরুর মূল উপদেশ এক হলেও শিষ্যদের যোগ্যতার অধিকারভেদে তা ভিন্ন ভিন্ন বলে প্রতীয়মান হয়।বৌদ্ধমতওএকথা বলে। যে গুরু স্বয়ংসিদ্ধ তাঁর অনুগ্রহ শিষ্যের অধিকার অনুযায়ী বিভিন্ন হয়ে থাকে। শিষ্য যদি খোলামনের হন তাহলে অনুগ্রহও নিরুপায় হয়, নাহলে সোপায়। এই সাংসিদ্ধিক গুরুই 'অকল্পিত' গুরু। যেহেতু নিজে তিনি অন্য আচার্যর সাহায্য ব্যতিরেকে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছেন তাই 'অকল্পিত' গুরু।

কিন্তু যাঁর সংতর্ক স্বতঃস্ফূর্ত নয়, তিনি অকল্পিত বা অন্য কোনো গুরুকে বিধি অনুযায়ী শুশ্রূষায় প্রসন্ন করে শাস্ত্রসম্মতভাবে গুরুর কাছ থেকে দীক্ষা নিয়ে শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করেন। এইভাবে গুরু-আরাধনায় তাঁর 'শুদ্ধবিদ্যা'র উন্মেষ হলে, পরে অভিষেকপ্রাপ্ত হয়ে অপরকে অনুগ্রহ করার ব্যাপারে অধিকারী হতে পারেন। এঁকেই বলা হয় 'কল্পিত' গুরু।

কিন্তু কল্পিত হয়েও যিনি গুরুর অপেক্ষা না করে নিজের প্রতিভাবলে লোকোত্তর শাস্ত্র সম্পর্কে আকস্মিকভাবে যথার্থ জ্ঞান লাভ করেন এবং সমস্ত রহস্য যাঁর কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়, তিনিই 'কল্পিতাকল্পিত' গুরু। কল্পিত হয়েও তাঁর বোধ স্বতঃপ্রবৃত্ত বলে তিনি অকল্পিত। এঁর ক্ষেত্রে কল্পিত অপেক্ষা অকল্পিত অংশই শ্রেষ্ঠ।

আর 'অকল্পিতকল্পক' হলেন তিনিই, স্বভাবসিদ্ধ হয়েও স্বয়মুদ্ভূত জ্ঞানের অভাবে যিনি গুরুর অপেক্ষা

না করে সোহংবাদী হন বা 'আমিই পরমহংস' এই ভাবনার দ্বারা শাস্ত্রজ্ঞ হয়ে ওঠেন। তাঁর জ্ঞান স্বভাবসিদ্ধ বলে অকল্পিত এবং নিজের ভাবনার দ্বারা শাস্ত্রবেদাদি কল্পিত বলে তিনি 'অকল্পিতকল্পক'। এই ধরণের গুরুরও আবার প্রকারভেদ আছে। তা নির্দিষ্ট হয় 'শক্তিপাতরূপ উপায়ের তীব্রতা'-র ভেদে।

কবীরের পদে 'সদগুরু' শব্দটির সম্যক অর্থ হৃদয়ংগম করতে গুরু সম্পর্কে ভারতবর্ষে আধ্যাত্মিক জগতের এইসব বিষয় আমাদের পক্ষে সামান্যভাবে হলেও জেনে রাখা প্রয়োজনীয় বলেই মনে হয়। 'অধ্যাত্মজীবনে গুরুর স্থান' সম্পর্কে মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ প্রাঞ্জলভাবে আলোচনা করেছেন। তবে, কবীর যখন মোহন্ত, মোল্লা, পীর, মুরশেদ, অবধূত, পাঁড়ে সকলকে একাধারে নাস্তানুবাদ করেন, খেয়াল রাখতে হবে হিন্দুধর্মের যে দিকটির সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল, কী গোরখ-পন্থের কী ইসলামের ক্ষেত্রেও, তার প্রতিনিধি কারা ছিল। তিনি সেই প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন। এ ব্যাপারে তিনিই যে প্রথম ব্যক্তি এমন নয়। কেননা হিন্দুধর্মের বাহ্যাচারের বিরুদ্ধে বৌদ্ধ এবং জৈনদের অবস্থান সূত্রেই প্রাচীন এক পরম্পরা ছিল এদেশে। প্রত্যেক ধর্মে বাহ্যিক ভেদ থাকলেও মূল লক্ষ্য যে এক, সেকথা তিনি জানতেন বলেই ভক্তি এবং প্রেমের পথে তাঁর সাধনা সেই 'এক'-এর মধ্যেই নির্গুণ ব্রহ্ম, কী অলখ নিরঞ্জন, কী আল্লার মহিমাকে উপলব্ধি করতে চেয়েছিল।

গুরু-প্রসঙ্গে স্মরণীয়, লালনের একাধিক গানে গুরু এবং মুরশিদের মধ্যস্থতার কথা পাওয়া যায়। রামপ্রসাদের গানেও তা অলভ্য নয়।

৬৯

নৌকা— দেহতরী। বৌদ্ধ সহজিয়াদের দোঁহায় এর ব্যবহার লক্ষ করা যায়। নৌকার রূপকে সাধনতত্ত্বের কথাই সেসবে প্রকাশিত হয়েছে। সরহপাদের একটি পদে আছে—

> কাঅ ণাবড়ি খাণ্টি মন কেড়ু আল।
> সদগুরু বঅণে ধর পতবাল।।
> চীঅ থির করি ধরহুরে নাই।
> আন উপায়ে পারণ জাই।।
> নোবাহী নৌকা টানঅ গুণে।
> মেলি মেলি সহজে জাউণ আণে।।
> বাটত ভঅ খার্ণ্টবি বলআ।
> ভব উলোলেঁ স বি বোলি আ।।
> কূল লই খরে সোন্তে উজায়।
> সরহ ভণই গঅণে সমাঅ।।

অর্থাৎ, 'এই ভব-সমুদ্রের মাঝখানে কায় হইতেছে নৌকা, খাটি মন দাঁড় বা বৈঠা; সদগুরুর বচনে হাল ধরিতে হইবে। চিত্ত স্থির করিয়া নৌকা ধরো, অন্য কোনো উপায়ে পারে যাইতে পারিবে না। নৌকাবাহী (মাঝি) নৌকা গুণে টানিতেছে,— নৌকা বাহিয়া গিয়া সহজের কূলেই পৌঁছিও— অন্য কোথাও না। পথে বেশ ভয় আছে,— জোরালো খুঁটা রহিয়াছে, ভব-উল্লোলে সবই বাধিত, অর্থাৎ ভব-স্রোতের দ্বারা সহজ পথের যাত্রা সর্বদাই বাধিত। কিন্তু এই ভব-প্রবাহের ভিতরেই কূল ধরিয়া খরস্রোতে উজাইয়া চলিতে হইবে, সরহ বলিতেছে,— তবেই গগনে গিয়া পৌঁছিতে পারা যায়,— অর্থাৎ সহজ শূন্যের কূলে গিয়া পৌঁছানো যায়।"

('ভারতীয় সাধনার ঐক্য'/ শশিভূষণ দাশগুপ্ত পৃ ২৩-২৪)

লক্ষণীয় কবীরের পদটির মূলভাবের সঙ্গে এর সাযুজ্য। আত্মজ্ঞানী কবীরের সদগুরু সম্পর্কিত মন্তব্যও লক্ষ করার মতো।

৭৭

আদেশ— গোরখপন্থীরা 'আদেশ-আদেশ' বলে।

৮৭

ঝনন ঝনন যন্ত্র বাজন——১০ সংখ্যক পদে 'নাদ ও বিন্দু' এবং ১৮ সংখ্যক পদে সূর্য ও চন্দ্রতত্ত্ব আলোচনা এই সূত্রে স্মর্তব্য। ১০ সংখ্যক পদে যে 'অনাহত নাদ'-এর কথা এবং ১৮ সংখ্যক পদে 'উন্মনা' অবস্থার প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে, সেই সূত্র ধরেই এখানে আমরা আলোচনা নির্দিষ্ট করব।

ক্রিয়া-বিশেষের মাধ্যমে যখন সুষুম্না পথ উন্মুক্ত হয়ে কুণ্ডলিনী-শক্তি জাগ্রত হয় অচঞ্চল প্রাণ তখন শূন্যমার্গে নিরন্তর অনাহত ধ্বনি বা নাদ শুনতে পায়। 'হঠযোগ-প্রদীপিকা'-য় বলছে—"মৌনাবলম্বী যোগী হস্তদ্বয় দ্বারা কর্ণদ্বয় আবরণ করিলে, দেহাভ্যন্তরে যে শব্দ শুনিতে পান, তাহাতেই স্থিরপদলাভ না হওয়া পর্যন্ত, চিত্ত স্থাপন করিবেন, (এইরূপে) অভ্যাস করিতে করিতে (ক্রমে) এই নাদ বাহিরের সমস্ত শব্দকে আবরণ করিবে, ইহাতে যোগী একপক্ষকালমধ্যে সমস্ত চিত্তবিক্ষেপ জয় করিয়া সুখী হইবেন [ইহাতে বাহ্যবিষয়রাশি হইতে চিত্তের অন্তর্মুখে প্রত্যাবর্তনরূপ প্রত্যাহার সাধিত হইল]। প্রথম অভ্যাসকালে নানাবিধ মহান নাদ শ্রুত হইয়া থাকে এবং নাদানুসন্ধানের অভ্যাস বৃদ্ধি পাইতে পাইতে ক্রমে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নাদ শ্রুত—প্রথমে সাগরকল্লোল, মেঘগর্জন, ভেরীবাদন ও ঝাঝরবাদ্য দ্বারা উৎপন্ন শব্দ, মধ্যে মাদল, শঙ্খ, ঘণ্টা ও কাঁসরবাদ্যজনিত শব্দ (এবং) শেষকালে কিঙ্কিণী (ক্ষুদ্র ঘণ্টাবিশেষ), বংশী, বীণা ও ভ্রমরধ্বনি ইত্যাদি নানাবিধ দেহমধ্যগত শব্দ শ্রুত হয়; (এই অভ্যাসকালে পূর্বোক্ত প্রণালীতে প্রত্যাহার সিদ্ধ হইলে পর,) মেঘ, ভেরী ইত্যাদির ন্যায় মহৎ শব্দ শ্রুত হইলেও তন্মধ্যেই (ক্রমে) সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর নাদের পরামর্শ (অর্থাৎ বিচারসহকারে অনুসন্ধানপূর্বক ধারণা) করিবে [ইহাতেই উৎকৃষ্টতর আশ্রয়ে চিত্তের স্থাপনরূপ ধারণা সাধিত হইল]।"… যোগীর নাদআসক্ত মন তখন মত্ত থাকে। যেমন মধুপানে মত্ত ভ্রমর অন্য কোনোদিকে তাকায় না—এমনকী গন্ধের কথাও যেমন সে ভুলে যায়, যোগীর অবস্থাও তেমনি। নাদরূপ বন্ধনে মন চাপল্য ত্যাগ করে ছিন্নডানা পাখির মতো স্থির হয়ে যায়।

আলোচ্য পদে যোগীর সেই উন্মনী অবস্থা তথা অভেদ-প্রতীতির প্রসঙ্গই আমরা পেয়ে যাই। কিন্তু এই অভেদ-প্রতীতি কবীরের মতো সাত্ত্বিক পন্থায় লাভ করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। উদ্ধৃত অংশের বিবরণ রাজসিক পন্থার। এই সূত্রেই স্মরণীয় ৬৬ সংখ্যক অনূদিত পদে কবীরের বক্তব্য: চক্ষু-কর্ণ বন্ধ করে, আসন-মুদ্রা সহযোগে যোগসাধনের রাজসিক পন্থার বিপরীতে গুরু-প্রদত্ত নামামৃত খেয়ে প্রেম-ভক্তির মাধ্যমে তথা সাত্ত্বিক পন্থায় পরমের সঙ্গে অভেদ-প্রতীতির পক্ষে কবীরের বক্তব্য একাধিক পদেই পাওয়া যায়।

আলোচ্য পদটিতে এবং ৬৬ সংখ্যক পদে 'নৃত্য'-প্রসঙ্গও এইসূত্রে লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথের গানে আমরা যেমন একাধিকবার এই নিত্যনৃত্যের উল্লেখ পেয়েছি, তেমনি এলিয়টের 'ফোর কোয়ার্টেটস'-এও তা দেখেছি। এলিয়টের উক্ত কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'বার্নট নর্টন'-এর অংশবিশেষও এইসূত্রে স্মরণীয় হয়ে ওঠে। যে 'still point'-এ 'there is only the dance', ভারতীয় অধ্যাত্ম-জগতের ভাবনায় প্রভাবিত এলিয়ট প্রকাশ করেন, আধুনিক পাঠকরা যে স্থিরবিন্দুর ব্যাখ্যানে আরো নানা জটিল ভাবনার আদল পেয়ে যান— ভূত-ভবিষ্যৎরূপ কালপ্রবাহের জ্ঞানাতিরিক্ত সেই অবস্থা, আপেক্ষিকতাবাদের সূত্র আধুনিক মনে যেসব ভাবনা উসকে দেয়—ফিজিকস আর মেটাফিজিকস যে-ভাবনায় কোনো সন্নিহিত কোণ খুঁজে পেতে চায় ZONE-এর কনসেপ্টে, আপাত বৈসাদৃশ্য সত্ত্বেও কোনো ভারের সম্পৃক্ততা খুঁজে পান কেউ নিভৃত বিজ্ঞানে—সেইসব বিচিত্রগামী ভাবনার কোনো ঐক্য যেন ক্ষীণাঙ্গ দু-একটি পদে শব্দের সংকেতে ধরা থাকে সুদীর্ঘ কাল যাবৎ। কবীরের পদে আমরা সেইসব আবহমান জিজ্ঞাসার সাক্ষাৎ পাই—বিন্দুর ভেতর সিন্ধু-দর্শন ঘটে হয়তো এভাবেই।

৮৯

পাঁচ পঁচিশ আর তিন— পঞ্চ প্রাণ, পঁচিশ তত্ত্ব এবং তিন যুগ। আটখানা ঘর— সপ্তবীজ তথা সপ্তধাতু— চর্ম, রুধির, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, বীর্য এবং এদের সঙ্গে কেশ মিলে আট ধাতু। ৫৪ সংখ্যক পদে 'বিন্দুধারণ' প্রসঙ্গে ফকিরি তত্ত্বের বক্তব্য দ্রষ্টব্য। দশ দরোজা— দুই চক্ষু, দুই কর্ণ,

নাসিকার দুই রন্ধ্র, মুখ, পায়ু এবং উপস্থ বা জননেন্দ্রিয় এবং ব্রহ্মরন্ধ্র। নয়টি কপাট— প্রথম নয়টি ছিদ্র। প্রাণায়ামের সাহায্যে যোগী তা বন্ধ করতে সক্ষম হন।

এই সূত্রেই স্মরণীয় লালনের 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কমনে আসি যায়' গানটি। বলা হচ্ছে—

আট কুঠরি নয় দরজা আঁটা,
মধ্যে মধ্যে ঝলকা-কাটা,
তার উপর আছে সদর কোঠা—
আয়না মহল তায়।

৯১

আগুন— ঈশ্বরবিরহের অগ্নি। ঘরখানা— মোহ-মায়াময় পৃথিবী। ডাইনি— মায়া। অবিদ্যা। মায়া মহাঠগিনী, এমনও বলেছেন কবীর। সমস্ত জীবজন্তুর সে নারী। মায়াকে বেশ্যা পর্যন্ত বলা হয়েছে। ৯১ এবং ৯২ সংখ্যক পদের ডাইনি এবং আদির আইবুড়ি একই অর্থে। পাঁচ ছেলে— পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বিষয়: শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ।

৯৩

জলে আগুন— আগুন অর্থাৎ ভগবদ্বিরহ, জল অর্থাৎ ভবসাগর। পাত্রখানা— মন। বিচার করে বিজ্ঞজনে দক্ষিণে উত্তরে— উত্তরের জ্ঞানমার্গী যোগী এবং দক্ষিণের বৈষ্ণবমার্গী পণ্ডিতরা এর মর্ম বুঝবে না। গুরু— শ্রীগুরু। চেলা— জীবের অহংভাব অর্থাৎ নিজেকে স্বতন্ত্র ভাবার অভিমান। আগুন— বিরহাগ্নি। তুচ্ছ তৃণ— নিরভিমান ভক্ত। ব্যাধ— শ্রীগুরু। হরিণ— মন। মাছ— মন। নদ-নদী— নদ অর্থে ভবসাগর, নদী অর্থে প্রবৃত্তিসমূহ। মাছগুলো— জীব। বৃক্ষ— ঊর্ধ্ব ব্রহ্মাণ্ডে। এই বৃক্ষ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য উপনিষদ কথিত ঊর্ধ্বমূল অধোশাখ সনাতন অশ্বত্থ বৃক্ষের কথা।

৯৫ ও ৯৯

সহজ— সহজ-সাধন।

প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা দরকার, লৌকিক ধর্মসম্প্রদায়সমূহের ভেতর ধর্মতত্ত্ব এবং প্রকরণে সূক্ষ্ম ভেদগুলি সম্পর্কে আমরা অধিকাংশই অবহিত না হবার ফলে বাউল এবং সহজিয়াদের ভেতরকার পার্থক্যও ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারি না। যত সহজে আউল-বাউল, কী সহজিয়া বলে গড়পড়তা হিশেব আমরা করি এই সব ভিন্ন ভিন্ন লোকধর্ম সম্পর্কে, বিষয়টি আদৌ সেরকম নয়। বাউলধারায় ইসলাম, সুফি-তত্ত্ব এবং ফকিরি-তত্ত্ব আর সহজিয়া ধারায় তন্ত্র, বৈষ্ণবধর্ম ও নাথপন্থের বিভিন্ন ধ্যান-ধারণা, ক্রিয়া-করণসমূহ মিলেমিশে আছে। একটির থেকে আরেকটির পার্থক্য খুবই সূক্ষ্ম। এঁদের ভেতরকার বিচ্ছিন্নতা এবং পাশাপাশি ভাবের সাযুজ্য লক্ষ না করলে ভ্রান্তি অনিবার্য।

৯৬

সহজ-সমাধি— কবীরের কাছে এই সহজ-সমাধি ছিল শ্রেষ্ঠ পন্থা। যার জন্য আসন মুদ্রা কোনোকিছুই প্রয়োজনীয় ছিল না। এই সূত্রে ৩৮ সংখ্যক পদের 'খসম' শব্দের আলোচনা দ্রষ্টব্য

৯৮

উলটে ঢোকে আপন মাঝে··· — উলটা-সাধন। ১৬ এবং ১৮ সংখ্যক পদের শব্দ-সংকেতগুলির আলোচনা দ্রষ্টব্য।

বর্ণানুক্রমিক প্রথম ছত্রের (মূলসহ) সূচি